Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা নাসরিন

রোলঃ 23090120709

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইমুনা নাসরিন

রোলঃ 23090120709

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাইমুনা নাসরিন, আইডিঃ 23090120709 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাইমুনা নাসরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মাইমুনা নাসরিন

আইডিঃ 23090120709

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

সাহাবীর সংজ্ঞা 2

সাহাবীগণের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস 3

সাহবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ 7

সাহাবীদের চোখে দুনিয়া 13

উমর ইবনুল খাত্তাব–রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর চোখে দুনিয়া 15

উসমান ইবনে আফফান –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া 17

আলী বিন আবু তালিব –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া 19

আবুল দারদা–রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া 21

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া 23

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত 24

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার এবং তার বিধান ও পরিণতি 26

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সম্মান ও মর্যাদা 53

হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদা 58

সাহাবীগণের মধ্যকার সংঘটিত ঘটনা নিয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা 63

উপসংহার 66

ভূমিকা

“নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য ও হিদায়াত প্রার্থনা করি আর আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আর যাকে পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।”

সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন এই উম্মাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তিবর্গ।তারা রাসূলের আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করার সুবাদে পৌঁছতে পেরেছিলেন উন্নত আচার-আচরণ ও উৎকৃষ্ট স্বভাব-প্রকৃতির সর্বোচ্চ চূড়াতে। যেখানে পৌঁছা সত্যিই অকল্পনীয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের জন্য তাদের রেখে যাওয়া জীবনাচারের চিত্র ও পৃথিবীতে তাদের বসবাসের দৃশ্য অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করে গিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।

আল্লাহ তা‘আলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসার তাওফীক দান করেন এবং তাদের দল বা জোটের সাথে আমাদেরকে হাশরের ব্যবস্থা করেন। আর আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছেই তাওফীক ও সঠিক পথ চাই।

وصلى الله و سلم و بارك على رسوله محمد و آله و صحبه

সাহাবীর সংজ্ঞা

এ বিষয়ে ইমাম বুখারী, সাঈদ ইবনুল মসাইয়িব, আব্দুল কুদ্দুস ইবনে মালেক আল-আত্তার,আলী ইবনুল মাদীনী সহ আরও অনেকর অনেক বক্তব্য রয়েছে। শুধুমাত্র হাফেয ইবনে হাজারের সংজ্ঞাটি এখানে তুলে ধরছি। তিনি বলেন-

الصَّحابِيُّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

“যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসুল মেনে এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনিই সাহাবী।”

নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁকে রাসুল মেনে এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর শর্তে র কারণে প্রিয় নবীর ‘সাহাবী’ হিসেবে বিবেচিত হবেন-

এক- যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা- বসা করেছেন।

দুই- যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সহচর্য পেয়েছেন।

তিন- যাঁরা মোটেও সহচর্য পাননি,(কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)

চার- যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ- যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।

ছয়- যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছেন।

সাত- দৃষ্টি শক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি। তাঁরা সকলেই সাহাবী।

পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান।কারণ সাহাবী হতে হলে মুমিন হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। নবীজীর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ইমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে সাহাবী বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমিন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।কারণ ‘প্রিয় নবীকে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...’এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি।যে ব্যক্তি নবীজীকে রাসূল মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ্),সেও সাহাবী নয়—-মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর শর্তের কারণে।যেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর পূর্বেই আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতে প্রিয় নবীর সঙ্গে পুণরায় সাক্ষাৎ না হলেও সাহাবী হিসেবে পরিগণিত।

সাহাবীগণের স্তর ও শ্রেণিবিন্যাস

হাকেম নীশাপুরী রহ. তার ‘মা‘রেফাতু ‘উলুমিল হাদীস’ নামক গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তিতা এবং মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে তাদের উপস্থিতির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দানের মাধ্যমে তাদেরকে বারোটি স্তর ও শ্রেণীতে বিন্যাস করেছেন।[5] সুতরাং তিনি বলেন,

১. প্রথম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন, আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম।

২. দ্বিতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন দারুন নদওয়ায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ। আর এটা হলো উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, তখন তাকে দারুন নদওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর তিনিসহ মক্কাবাসীর মধ্য থেকে একদল সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

৩. আর তৃতীয় স্তরের সাহাবীগণ হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবী, যারা হাবশায় হিজরত করেছেন।

৪. আর চতুর্থ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা ‘আকাবা নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ গ্রহণ করেছেন।

৫. আর পঞ্চম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা ‘আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের অধিকংশ ছিলেন আনসার সাহাবী।

৬. আর ষষ্ঠ স্তরের সাহাবীগণ হলেন সেসব মুহাজির, যারা মদীনায় প্রবেশ ও মসজিদ বানানোর পূর্বে ‘কুবা’ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছেছেন।

৭. আর সপ্তম স্তরের সাহাবী হলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم ْ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন এবং তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"[6]

৮. আর অষ্টম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা বদর যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন।

৯. আর নবম স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা বায়'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন:

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨﴾ [الفتح : ١٨]

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

আর বায়'আতে রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়েছিল হুদায়বিয়া নামক স্থানে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফির কর্তৃক ওমরা পালনে বাধাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

১০. আর দশম স্তরের সাহাবী হলেন ঐসব মুহাজির সাহাবীগণ, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। তাদের মাঝে অন্যতম হলেন খালিদ ইবন ওয়ালিদ, 'আমর ইবনুল 'আস, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম প্রমুখ এবং এ স্তরের সাহাবীগণের সংখ্যা অনেক।

১১. আর একাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং তারা হলেন কুরাইশ গোত্রের একটি দল।

১২. আর দ্বাদশ স্তরের সাহাবীগণ হলেন ছোট্ট শিশু-কিশোর কম বয়সীদের মধ্য থেকে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন মক্কা বিজয়ের দিন, বিদায় হজের দিনসহ বিভিন্ন সময়ে এবং তাদেরকে সাহাবীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়।

আবার মোটামুটিভাবে সাহাবীগণের স্তরকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যাসের বিষয়টিও প্রসিদ্ধ:

প্রথম স্তর: বড় বড় সাহাবীগণের স্তর। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ।

দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ।

তৃতীয় স্তর: ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যারা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন অথবা যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ছোট ছিলেন।[7]

উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তারা সকলেই যে ন্যায়পরায়ণ এবং নবীগণের পরেই তারা যে দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের সকলের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التوبة : ١٠٠]

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।”[সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الحديد: ١٠]

"তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা (এবং পরবর্তীরা) সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্যই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" [সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ১০]

সুতরাং সততাও ন্যায়পরয়ণতার প্রশ্নে সাহাবীগণের সকলেই সমান।

সাহাবীগণের সংখ্যা: আর সাহাবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এক লক্ষের অধিক হিসেবে। আর আবু যুর'আ আর-রাযী তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার বলে।[৪]

সাহবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ:

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট সাহাবীগণের 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি অকাট্য আকীদা (বিশ্বাস) বিষয়ক মাসআলাসমূহের অন্তর্ভুক্ত অথবা বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে জানা দীনী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এর স্বপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল রয়েছে; নিম্নে কিছু উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা হলো:

প্রথমত: আল-কুরআন থেকে সাহাবীগণের সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ:

প্রথম আয়াত: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا ١٨﴾ [الفتح : ١٨]

"অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন। ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮]

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন,

«كنا ألفا وأربعمائة ».

"আমরা (সে শপথ অনুষ্ঠানে) ছিলাম সংখ্যায় এক হাজার চারশত।"[1]

সুতরাং এ আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেছেন আর এ তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধির সংবাদ আল্লাহই পরিবেশন করেছেন। আর আল্লাহ ব্যতীত তা সম্পন্ন করার ক্ষমতা অন্য কেউ রাখে না। আর তা হলো তাদের অভ্যন্তরীণ ও হৃদয়ের মধ্যে যা

কিছু আছে তার পরিশুদ্ধি। আর সেখান থেকেই তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। (আর আল্লাহ তা‘আলা যার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, কুফুরীর ওপর তার মৃত্যু হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তার শিক্ষা হলো ইসলামের ওপর মারা যাওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও ওপর প্রযোজ্য হবে না, যার ব্যাপারে তিনি জানেন যে, তার মৃত্যু হবে ইসলামের ওপর)।[2]

আর সহীহ মুসলিমে যা বিদ্যমান রয়েছে, তা এ বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ় করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»لاَ يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا .«

“আল্লাহ চায় তো গাছের নিচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে একজনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।”[3]

ইবনু তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন: “আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি একটি প্রাচীন গুণ। সুতরাং তিনি শুধু ঐ বান্দার ওপরই সন্তুষ্ট হন, যার ব্যাপারে তিনি জানেন যে, সে তাকে সন্তুষ্টির আবশ্যকীয় উপাদানগুলো পূর্ণ করে দিবেন। আর যার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন, তার ওপর তিনি কখনও অসন্তুষ্ট হন নি। অতএব, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই জান্নাতের অধিবাসী, যার ব্যাপারে আল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যদিও তার ওপর তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার বিষয়টি ছিল তার ঈমান আনয়ন ও সৎকর্মের পরে। সুতরাং তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করেন তার গুণগান ও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে। অতএব, তিনি যদি জানতেন যে, সে এর পরবর্তীতে এমন কাজ করবে, যাতে প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হবেন, তাহলে সে জান্নাতের অধিবাসী হত না।”[4]

ইবনু হাযম রহ. বলেন: “যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সংবাদ জানিয়েছেন, তিনি তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে জানেন এবং তিনি তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন; আর তাদের উপর নাযিল করেছেন প্রশান্তি। সুতরাং কারও জন্য বৈধ হবে না তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করা অথবা তাদের ব্যাপারে কখনও সন্দেহ পোষণ করা।”[5]

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩ ﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু‘ ও সাজদাহয় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডল সাজদাহর প্রভাবে পরিস্ফুট; এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে -আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।”[সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

ইমাম মালেক রহ. বলেন: “আমার নিকট এ খবর এসেছে যে, খ্রিস্টানগণ যখন ঐসব সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমকে দেখেছিল, যারা শাম (সিরিয়া) জয় করেছেন, তখন তারা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তারা ঐসব হাওয়ারীদের চেয়ে উত্তম, যাদের ব্যাপারে আমরা ইতোপূর্বে জানতে পেরেছি। আর এ প্রসঙ্গে তারা সত্যই বলেছে। কারণ, এ উম্মত (জাতি) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে সম্মানিত। আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। আর আল্লাহ তা‘আলা নাযিলকৃত কিতাবসমূহে ও হাদীসের মধ্যে তাদের কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। আর এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা সেখানে বলেছেন: ﴿ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ ﴾ “এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত”। অতঃপর তিনি বলেন: ﴿ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ ﴾ “আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা”। ﴿فَـَٔازَرَهُۥ﴾ “তারপর তা শক্ত হয়”। অর্থাৎ মজবুত হয়। ﴿فَٱسۡتَغۡلَظَ﴾ “তারপর তা পুষ্ট হয়” অর্থাৎ তা পুষ্ট ও লম্বা হয়। ﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾ “অতঃপর তা কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক” অর্থাৎ অনুরূপ হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তারা তাকে শক্তিশালী করেছেন, সমর্থন করেছেন এবং তাকে সাহায্য করেছেন। সুতরাং তাঁর সাথে তাদের সম্পর্ক গাছের সাথে পাতা বা কচিপাতার সম্পর্কের মতো, (আল্লাহ) তাদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের

অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।”[6] ইবনুল জাওযী বলেন, “এ গুণটি অধিকাংশের নিকট সকল সাহাবীর জন্য সাব্যস্ত।”[7]

তৃতীয় আয়াত: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ٨، ١٠]

“এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী। আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালোবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোনো (না পাওয়া জনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। বস্তুত যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম। আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।”[সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৮-১০]

আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াতসমূহের মধ্যে ‘ফায়’[8] তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের হকদারদের অবস্থা ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। আর তারা হলেন তিন প্রকারের:

প্রথম প্রকার: ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ﴾ অর্থাৎ নিঃস্ব মুহাজিরগণ।

দ্বিতীয় প্রকার: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ﴾ অর্থাৎ মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে।

তৃতীয় প্রকার: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ﴾ অর্থাৎ যারা তাদের পরে এসেছে।

আর ইমাম মালেক রহ. এ আয়াত থেকে কি সুন্দর ফতোয়া উদ্ভাবন করছেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে গালি দিবে, তার জন্য 'ফায়' বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোনো অংশ নেই। কারণ, সে ঐসব সাহাবীগণের গুণে গুণান্বিত হতে পারে নি, আল্লাহ তা'আলা যাদের প্রশংসা করেছেন। তাদের কথায়:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : ١٠]

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

সা'আদ ইবন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

»الناس على ثلاث منازل: فمضت منزلتان و بقيت واحدة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت قال : ثم قرأ : ﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾ [الحشر: ٨] فهؤلاء المهاجرين وهذه منزلة قد مضيت: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ﴾ [الحشر: ٩] قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضيت ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠] قد مضيت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت: أن تستغفروا لهم «

"মান-মর্যাদার দিক থেকে মানুষ তিন শ্রেণী বা স্তরে বিভক্ত। সুতরাং দুই শ্রেণির মানুষ অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর অবশিষ্ট আছে এক শ্রেণির মানুষ। অতএব, সবচেয়ে সুন্দর হয় যখন তোমাদের অবস্থান হবে ঐ স্তরের সাথে যা অবশিষ্ট আছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি পাঠ করেন:

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا﴾ [الحشر : ٨]

সাহাবীদের চোখে দুনিয়া

আবু বকর সিদ্দিক- রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর চোখে দুনিয়া

সমস্ত সম্পদ দান করা এবং পুরোনো কাপড় দিয়ে কাফন পরানোর নির্দেশ:

আয়েশা-রাদিয়াল্লাহু আনহা– থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমার পিতার মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হলো, তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, “হে আমার প্রিয় কন্যা, আমি তোমাকে খায়বারের খেজুর দিয়েছিলাম,অথচ তুমি তা নিতে চাচ্ছিলেন না। আমি এখন চাচ্ছি যে, তুমি সেগুলো আমাকে ফেরত দাও।”

আয়েশা–রাদিয়াল্লাহু আনহা–বললেন, ‘আমি তখন কেঁদে ফেললাম। বললাম,বাবা, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।পুরোটা খায়বার যদি স্বর্ণ হতো তবুও আমি তা আপনাকে ফেরত দিতাম।’ তিনি তখন বললেন, “হে আমার প্রিয় কন্যা, তা আল্লাহ্ তায়ালার হিসেবের মধ্যে রয়েছে। আমি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলাম এবং আমার প্রচুর সম্পদ ছিলো। কিন্তু যখন খিলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ভাবলাম, আমার যতোটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি সম্পদ আমি গ্রহণ করবো না।হে প্রিয় কন্যা, আমার সম্পদের মধ্যে রয়েছে এই কাতওয়ানি আলখাল্লা, একটি দুধ দোহনের পাত্র এবং একজন গোলাম। আমার মৃত্যুবরণ করার পর দ্রুত এগুলো উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে পৌঁছে দেবে। হে প্রিয় কন্যা, এগুলো হলো আমার কাপড়,তোমরা এগুলো দিয়ে আমার কাফন পরাবে।”

আয়েশা–রাদিয়াল্লাহু আনহা–বললেন, ‘আমি তখন কেঁদে ফেলে বললাম,বাবা, আমাদের তো এর চেয়ে বেশি কিছু আছে।(নতুন কাপড় কেনার সামর্থ্য আছে।) তিনি বললেন, “আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন।তা তো পরবর্তী মানুষদের বেশি প্রয়োজন।” আয়েশা – রাদিয়াল্লাহু আনহা–বলেন, ‘আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি ঐ জিনিসগুলো উমর ইবনুল খাত্তাব–রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম।’ তিনি বললেন, “ তোমার পিতা তাঁর ব্যাপারে কারও সমালোচনা করার সুযোগ রেখে যেতে চাননি।”

জিহ্বা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত করে:

যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,উমর-রাদিয়াল্লাহু আনহু– দেখলেন, আবু বকর সিদ্দিক –রাদিয়াল্লাহু আনহু –জিহ্বা বের করে দিয়ে টেনে

ধরেছেন।উমর–রাদিয়াল্লাহু আনহু–জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা,আপনি কী করছেন?”জবাবে তিনি বললেন, “এটাই আমাকে ধ্বংসের স্থানে নিক্ষেপ করেছে।”

কয়েকটি দিনারের জন্য শাস্তি পাওয়ার ভয়:

আবু দামরাতা অর্থাৎ ইবনে হাবিব বিন সুহাইব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর–রাদিয়াল্লাহু আনহু – এর এক পুত্রের মৃত্যু উপস্থিত হলো।সে কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো।তার মৃত্যুর পর উপস্থিত লোকেরা আবু বকরকে বললেন, আমরা আপনার ছেলেকে দেখলাম কেবল বালিশের দিকে তাকাচ্ছিলো।এ কথা বলে তাঁরা বালিশটা উঠালেন এবং বালিশের নিচে পাঁচটি অথবা ছয়টি দিনার পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু বকর – রাদিয়াল্লাহু আনহু – তখন হাতের ওপর হাত বাড়ি দিয়ে বার বার বলতে লাগলেন –

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

“নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাবো।”

এবং বললেন,”হে অমুক,আমি মনে করি না তোমার চামড়া তার (শাস্তি ভোগের জন্য) যোগ্য।”

উমর ইবনুল খাত্তাব-রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে দুনিয়া

কন্যাকে ধমক দিয়ে বিদায় করলেন:

হাসান বসরি- রাহিমাহুল্লাহ-বলেন, ‘উমর-রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর কাছে কিছু সম্পদ নিয়ে আসা হলো।এই সংবাদ তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হাফসা-রাদিয়াল্লাহু আনহা -এর কাছে পৌঁছলে তিনি এসে বললেন, “হে আমিরুল মুমিনীন,এই সম্পদে আপনার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা এই সম্পদ থেকে নিকটাত্মীয়দের দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।” তখন উমর-রাদিয়াল্লাহু আনহু - বললেন, “হে কন্যা, আমার নিকটাত্মীয়দের হক রয়েছে আমার নিজের সম্পদে; আর এগুলো হলো মুসলমানদের খরচ মেটানোর জন্য। তুমি তোমার পিতাকে ধোঁকা দিচ্ছো আর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য কল্যাণ কামনা করছো?যাও এখান থেকে।”তখন হাফসা-রাদিয়াল্লাহু আনহা-তাঁর কাপড়ের আঁচল টানতে টানতে উঠে এলেন।’

তাঁর জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছে

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ -রাদিয়াল্লাহু আনহু -থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ একটি স্বর্ণ-নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম,এটি কার জন্য? ফেরেশতারা বললো,কুরাইশের এক ব্যক্তির।হে ইবনুল খাত্তাব, তোমার আত্মমর্যাদাবোধ বিষয়ে জানা থাকাটাই আমাকে সেই প্রাসাদে প্রবেশ থেকে বিরত রেখেছিলো।” উমর -রাদিয়াল্লাহু আনহু -বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার ওপরও কি আমার আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করবো!”

রাতের ঘুম বিঘ্ন ঘটায় ইবাদতে এবং দিনের ঘুম কর্তব্যে:

মুআবিয়া বিন খুদাইজ-রাদিয়াল্লাহু আনহু -বলেন, আমর ইবনুল আস - রাদিয়াল্লাহু আনহু- আমাকে আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের সংবাদ দিয়ে উমর -রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর কাছে পাঠালেন। দুপুরের দিকে আমি মদিনায় পৌঁছলাম এবং আমার বাহন মসজিদের ফটকের সঙ্গে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন উমর-রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো।সে আমাকে সফরের পোশাকে দেখতে পেয়ে ভেতরে চলে গেলো।(তারপর আবার

এসে) বললো, "আমিরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকছেন" মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ জানালেন। উমর –রাদিয়াল্লাহু আনহু–বললেন, "এই মেয়ে ঘরে কি কোনো খাবার আছে?"

সে রুটি ও তেল নিয়ে এলো। উমর–রাদিয়াল্লাহু আনহু –বললেন, " তুমি খাও।" মুআবিয়া বিন খুদাইজ–রাদিয়াল্লাহু আনহু –বলেন, "আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেতে থাকলাম।" তিনি বললেন, "তুমি খাও, মুসাফির তো খাবার খেতে পছন্দ করে।" তারপর বললেন, "এই মেয়ে, খেজুর আছে কি?" মেয়েটি একটি পাত্রে খেজুর নিয়ে এলো। তিনি বললেন, "খাও।"আমি লজ্জার সঙ্গে তা খেলাম। তারপর তিনি বললেন, "হে মুআবিয়া, মসজিদে প্রবেশ করে তুমি কি ভাবছিলে?"আমি বললাম, "ভাবছিলাম, আমিরুল মুমিনীন এখন দিবা নিদ্রায় আছেন।" আমার কথা শুনে তিনি বললেন, "তুমি যা ভেবেছো তা কতই না নিন্দনীয়! যদি আমি দিনের বেলা ঘুমাই তবে আমার দায়িত্ব- কর্তব্য কে অবহেলা করবো আর যদি রাতের বেলা ঘুমাই তবে আমি (আমল-ইবাদত না করার কারণে) নিজেকেই বিনষ্ট করবো।এ দুটি কারণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি কীভাবে ঘুমাতে পারি,হে মুআবিয়া?"

নিজের স্ত্রীকে সুগন্ধি মাখতে দিলেন না:

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস –রাদিয়াল্লাহু আনহু–বলেন,উমর–রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর কাছে বাহরাইন থেকে মিসক ও আম্বর সুগন্ধি এলো। তিনি বললেন, "যদি আমি এমন কোনো মহিলা পেতাম যে ভালো ওজন করতে পারে তবে এ সুগন্ধি মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম।" তখন তাঁর স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল বললেন, আমি ভালো ওজন করতে পারি। এগুলো দিন আমি ওজন করে দিই।" উমর–রাদিয়াল্লাহু আনহু – বললেন, "আমার আশংকা হয় (সুগন্ধীর ওজন মাপতে গিয়ে তোমার হাতে কিছুটা লেগে যাবে) তুমি তা নিয়ে নিবে এবং এভাবে ব্যবহার করবে।" একথা বলে তিনি তাঁর দুই জুলফিতে আঙ্গুল ঘষে দেখালেন। "এবং তা তোমার গলায় ঘষবে; এভাবে আমার ভাগে অন্য মুসলমানদের চেয়ে বেশি পড়ে যাবে।"

উসমান ইবনে আফফান –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া

আমিরুল মুমিনীন হয়েও কোনো পাহারাদার রাখেননি:

জাফর বিন বুরকান হামদানি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি উসমান বিন আফফান –রাদিয়াল্লাহু আনহু –কে একটি কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর আশেপাশে কেউই ছিল না।(কোনো পাহারাদার ছিল না।) অথচ তখন তিনি আমিরুল মুমিনীন।"

স্বপ্নে শহীদ হওয়ার সুসংবাদ

আবু হুরায়রা – রাদিআল্লাহু আনহু –বলেন, "উসমান বিন আফফানকে তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি আমাকে বলেন,সাহরির সময় (সুবহে সাদিকের আগে) আপনি আমাকে ডেকে দিবেন। সাহরির সময় আমি তাঁর কাছে এলাম এবং বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন,সাহরির সময় হয়েছে। তিনি তখন তাঁর চেহারা মুছলেন এবং বললেন, 'ইয়া সুবহানাল্লাহ!হে আবু হুরায়রা, আপনি তো আমার স্বপ্ন ভেঙে দিলেন। আমি স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ–সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–কে দেখলাম । তিনি আমাকে বললেন, আগামীকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ইফতার করবে।' সে দিনই তিনি শহীদ হলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতি রহম করুন।"

পবিত্র হৃদয় আল্লাহর কালাম পাঠে ক্লান্ত হয় না

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ–রাহিমাহুল্লাহ–বলেন, উসমান বিন আফফান–রাদিয়াল্লাহু আনহু –বলেছেন, "তোমাদের অন্তর যদি পবিত্র হয় তবে আল্লাহ তায়ালার কালাম পাঠে তোমাদের কখনো পরিতৃপ্তি আসবে না।" (অর্থাৎ তেলাওয়াতের তৃষ্ণা তোমাদের থেকেই যাবে।)

ঘুমের পর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ লেগে থাকতো

ইউনূস বিন উবাইদ বলেন, হাসান বসরী –রাহিমাহুল্লাহ–কে যাঁরা মসজিদে দ্বিপ্রহরে ঘুমাতেন তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি উসমান বিন আফফান –রাদিয়াল্লাহু আনহু –কে দ্বিপ্রহরে মসজিদে ঘুমাতে দেখেছি। অথচ তখন তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা।

তিনি যখন দাঁড়াতেন তাঁর পার্শ্বদেশে কঙ্করের দাগ দেখা যেতো। অন্যরা বলাবলি করতেন, “ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন,ইনি হলেন আমিরুল মুমিনীন।”

নিজেই ওজুর পানি এনে ওজু করতেন

আব্দুল্লাহ বিন আর-রুমি–রাহিমাহুল্লাহ–বলেন, “উসমান বিন আফফান –রাদিয়াল্লাহু আনহু – রাতের বেলা জাগতেন এবং নিজেই ওজুর পানি নিয়ে ওজু করতেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলতেন, আপনি কি খাদেমদের নির্দেশ দিতে পারেন না তারা এসে আপনাকে ওজুর পানি দিয়ে যাবে? তিনি বলতেন, না, বিশ্রাম করার জন্য তাদের ঘুমের অধিকার রয়েছে।”

আলী বিন আবু তালিব –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া

ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছিলেন

মুহাম্মদ বিন কা'ব আল-কুরাযি আলী–রাদিয়াল্লাহু আনহু –থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ –সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সঙ্গে ছিলাম, তখন এমনও অবস্থা হয়েছে যে, ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছি। অথচ আজকে আমার সদকার পরিমাণ চল্লিশ হাজার।"

পরিচয় গোপন রেখে জামা ক্রয়

আবু মাতার–রাহিমাহুল্লাহ–বলেন, "আমি আলী–রাদিয়াল্লাহ আনহু –কে দেখলাম তিনি লুঙ্গি-পরিহিত, গায়ে চাদর জড়ানো এবং সঙ্গে একটি বর্শা। যেনো তিনি গ্রাম্য বেদুইন।এই বেশে তিনি সুতি কাপড়ের বাজারে (দারে ফুরাত) পৌঁছলেন। তিনি একটি জামার দাম তিন দিরহাম বললেন। কিন্তু লোকটি তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তাঁর থেকে কিছু কিনলেন না। তারপর আরেক জন দোকানির কাছে এলেন। সেও তাঁকে চিনে ফেলায় তিনি তার থেকেও কিছু কিনলেন না। তারপর তিনি একজন কিশোর দোকানির কাছে এলেন এবং তার থেকে তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন।

কিশোরটির বাবা দোকানে এলে কোনো লোক তাকে জানালো (যে, তার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের কাছে তিন দিরহামে একটি জামা বিক্রি করেছে।অথচ সে তা দুই দিরহামে বিক্রি করতো)।ফলে কিশোরটির বাবা একটি দিরহাম নিয়ে আলী –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর কাছে এসে বললো,হে আমীরুল মুমিনীন,এই দিরহামটি নিন। তিনি বললেন, "এটা কিসের দিরহাম?"লোকটি বললো, "আপনি যে জামাটি ক্রয় করেছেন তার দাম দুই দিরহাম।"তখন তিনি বললেন, "সে আমার কাছে জামাটি আমার সম্মতিতে বিক্রি করেছে এবং তার সম্মতিতে জামাটির মূল্য গ্রহণ করেছে।"(তাই তিনি দিরহামটি নিলেন না।)

নিজ হাতে কাজ করে খাদ্য উপার্জন

মুজাহিদ–রাহিমাহুল্লাহ–থেকে বর্ণিত,আলী –রাদিয়াল্লাহু আনহু –বলেছেন, "আমি একটি বাগান বা উদ্যানের কাছে এলাম।তার মালিক বললো, বাগানে এক বালতি পানি দেওয়ার বিনিময়ে একটি খেজুর পাবে।(এতে কি তুমি রাজি আছো?) তখন আমি একটি খেজুরের বিনিময়ে

এক বালতি করে পানি দিতে শুরু করলাম। খেজুরে আমার হাত ভরে গেলো। তারপর পানি পান করলাম। অতঃপর হাত ভর্তি খেজুর নিয়ে রাসুলুল্লাহ– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– এর কাছে এলাম।তার কিছুটা তিনি খেলেন, কিছুটা আমি খেলাম।”

পরনের চাদর বিক্রি

আবু বাহর –রাহিমাহুল্লাহ –তাঁদের শায়খ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আলী– রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর পরনে একটি মোটা চাদর দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, “ আমি এটি পাঁচ দিরহাম দিয়ে খরিদ করেছি ।কেউ যদি আমাকে এক দিরহাম বাড়িয়ে দেয় তবে আমি তা তার কাছে বিক্রি করবো।” বর্ণনাকারী শায়খ বলেন, আমি তাঁর কাছে কিছু খুচরা দিরহাম দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, “আমরা ইয়ানবু থেকে যে ভাতা পাই তা থেকে এগুলো উদ্বৃত্ত হয়েছে।”

আবুল দারদা-রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর চোখে দুনিয়া

তাঁর পাপসমূহই তাঁর অসুখ

মুআবিয়া ইবনে কুর্বা আল মুযানি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,আবুদ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু -অসুস্থতা বোধ করলে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি অসুখ,হে আবুদ দারদা?" তিনি বললেন, "আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে আপনি কি কামনা করেন?" তিনি বললেন, "আমি জান্নাত কামনা করি।" তাঁরা বললেন, "আমরা কি আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনবো না?" তিনি বললেন, "যিনি ডাক্তার তিনিই তো আমাকে শুইয়ে রেখেছেন।"

যিকিরকারীরা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে

জুবায়ের বিন নুফাইর রাহিমাহুল্লাহ-তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবুল দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু-বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যাদের জিহ্বা আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা জানতে পারলে মানুষ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকতো

হিযাম বিন হাকিম রাহিমাহুল্লাহ-বলেন, আবুল দারদা -রাদিয়াল্লাহু আনহু -বলেছেন, "তোমরা মৃত্যুর পর যা কিছুর মুখোমুখি হবে তা যদি জানতে পারতে তাহলে তোমরা প্রবৃত্তিবশত (মন যা চায় তাই) কোনো খাবার খেতে না এবং প্রবৃত্তিবশত কোনো পানীয় পান করতে না, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য কোনো গৃহে প্রবেশ করতে না; বরং তোমরা পাহাড়ে অবস্থান করার জন্য লালায়িত হয়ে,বুক চাপড়াতে এবং নিজেদের জন্য কান্নাকাটি করতে।হায়, আমি যদি কোনো গাছ হতাম, আমাকে কেটে ফেলা হতো অথবা খেয়ে ফেলা হতো!" বুরদ বলেন, আমার কাছে এই রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, একবার আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু -এর পাশ দিয়ে একটি পাখি উড়ে গেলো। তিনি পাখিটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে পাখি, তুমি কতই না ভাগ্যবান! তুমি ফলমূল খাও, বৃক্ষরাজিতে বিশ্রাম নাও।অথচ এ জন্য তোমাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না।"

মুমিনের জিহ্বা আল্লাহর কাছে প্রিয়

আসাদ বিন ওয়াদাআ –রাহিমাহুল্লাহ –বলেন, আবুল দারদা–রাদিয়াল্লাহু আনহু –বলেছেন, “মুমিন ব্যক্তির শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জিহ্বার তুলনায় অধিক প্রিয়, জিহ্বার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।আর কাফেরের শরীরে এমন কোনো অঙ্গ নেই যা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তার জিহ্বা থেকে ঘৃণ্য, জিহ্বার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।”

চরিত্রের সৌন্দর্যই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে

শাহর থেকে বর্ণিত, উম্মুল দারদা–রাদিয়াল্লাহু আনহা–বলেছেন,আবুল দারদা একবার রাত্রি জাগরণ করে নামায পড়লেন, নামায পড়ার পর কাঁদতে শুরু করলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, “ হে আল্লাহ, আপনি আমার আকৃতিকে সুন্দর বানিয়েছেন, সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর বানান।” ভোর পর্যন্ত তিনি এই দোয়াই করলেন। আমি বললাম, হে আবুদ দারদা, রাত থেকে নিয়ে ভোর পর্যন্ত আপনি সচ্চরিত্রতার ব্যাপারেই দোয়া করে গেলেন।
তিনি বললেন, “হে উম্মুল দারদা, মুসলমান বান্দার চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তবে চরিত্রের সৌন্দর্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়; যদি তার চরিত্র খারাপ হয়, তবে চরিত্রের দোষই তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়।আর মুমিন বান্দাকে তার ঘুমন্ত অবস্থায়ও ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” আমি জিজ্ঞেস করলাম,তা কীভাবে? তিনি বললেন, “তার ভাই রাতে জাগ্রত হয় এবং তাহাজ্জুদ পড়ে, তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার দোয়া কবুল করে নেন।সে তার বাবার জন্য দোয়া করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার দোয়া কবুল করে নেন।”

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ –রাদিয়াল্লাহু আনহু –এর চোখে দুনিয়া

গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করে দিলেন

তালহা বিন ইয়াহইয়া –রাহিমাহুল্লাহ –তাঁর দাদী সু’দা বিনতে আওফ আল-মুররিয়্যাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “তালহা একদিন ভোরে চিৎকার করে উঠলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,কী হয়েছে আপনার? আপনি এমন কোনো কারণে দিশেহারা যার জন্য আমি আপনাকে তিরস্কার করবো?” তিনি বললেন, “আরে না, আল্লাহর কসম! তুমি অতি উত্তম স্ত্রী; বরং ব্যাপার হলো, আমার কাছে কিছু সম্পদ জমা হয়েছে। সেটাই আমাকে পেরেশান করছে।” আমি বললাম, “আপনার গোত্রের লোকদের ডেকে আপনি তা দিয়ে দিন।” তিনি গোলামকে ডেকে বললেন, “হে গোলাম, তুমি আমার গোত্রের লোকদের ডেকে নিয়ে আসো।” তারা এলে তিনি তাদের মধ্যে তার সম্পদ বণ্টন করে দিলেন। সু'দা বলেন, আমি খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, “কী পরিমাণ সম্পদ ছিলো?”সে বললো, “চার লাখ।”

একনিষ্ঠভাবে নামায আদায়

হিশাম বিন উরওয়া–রাহিমাহুল্লাহ–বলেছেন, আমাকে মুহাম্মদ বিন আল-মুনকাদির বলেছেন, তুমি যদি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবাইরকে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেতে তাহলে বলতে, ঝড়ো বাতাসের ভেতরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বৃক্ষ এবং মানজানিকের ইতস্তত পাথর নিক্ষেপের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন একজন মানুষ।”

সম্পদ থাকার ভয়ে ঘেমে উঠলেন

হাসান বসরি–রাহিমাহুল্লাহ–বলেন, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ –রাদিয়াল্লাহ আনহু–সাত লাখ দিরহামের বিনিময়ে একটি জমি বিক্রি করলেন।এই সম্পদ তাঁর কাছে মাত্র এক রাত থাকলো। কিন্তু তিনি এই সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।”

তাঁর চোখে অশ্রু লেগে থাকতো

আবু রাজা আল-উতারিদ–রাহিমাহুল্লাহ–বলেন, “আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস–রাদিয়াল্লাহ আনহুমা-কে দেখেছি এবং তার চোখের নিচে দেখেছি জীর্ণ রশির মতো অশ্রু।”

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা: উম্মতের প্রতি ওয়াজিব সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষন করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত) কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করা। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম নিষ্পাপ নন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে।প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই ‘যুদ্ধ’ বা ‘লড়াই’ নামে আখ্যায়িত করেন ‘মুশাজারাহ’ নামে।যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ।যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব।কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।

উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, ‘জামাল’ (উটের) যুদ্ধে আলী রাদিআল্লাহু আনহুর মতো সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভুলের ওপর।

একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী ছিলেন হকের ওপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন ভুলের উপর। অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘ইজতেহাদী খতা’ রূপে,যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ‘গুনাহ’ নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসেবে পূর্ণ চেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে,ও ব্যক্তিও সাওয়াব থেকে মাহরুম হয় না।(সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দুটো সওয়াব,আর ভুল হলে) একটি সাওয়াব সেও পায়
।

এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে ‘সঠিক মত’ ও ‘ভুল মত’ চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে।এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লামা কুরতুবী রহ. আহলুস সুন্নাহ এর নীতি - আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে:

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে ‘আশারায়ে মুবাশশরা’ এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবীজীর ভবিষ্যত বাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বদলা বা ‘কেসাস’ এর দাবিতে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন।প্রিয় নবীর হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।”

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয় প্রিয় নবীর ভবিষ্যতবাণী,যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়,হযরত তালহা ও যুবারা রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন,সে কারণেই তাঁরা দুজনও শহীদ।একই সঙ্গে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না,সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য।উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব গরজে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে।ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবীর নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস –যা সাহাবায়ে কেরাম কে কোনো প্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার এবং তার বিধান ও পরিণতি

প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহাবীগণকে গালি দেওয়া ও তার বিধান

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিষয়টি কয়েক প্রকারে বিভক্ত আর প্রত্যেক প্রকারের গালির জন্য নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

আর গালি হলো এমন কথা বলা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা হ্রাস করা ও হেয় প্রতিপন্ন করা। গালি থেকে মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে তাদের বিবেক-বুদ্ধি সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়। যেমন, অভিশাপ দেওয়া, মন্দগুণে ভূষিত করা ইত্যাদি।[1]

আর সহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে গালি দেওয়া মানে তাদের কাউকে কাউকে নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া। সুতরাং কেউ কাফির বা ফাসিক বলে গালি দেয়, আবার কেউ কৃপণ ও বেআক্কেলের মতো দুনিয়াবী বিষয়ের মাধ্যমে গালি দেয়, আর এ গালি তাদের সকলের উদ্দেশ্যে হতে পারে অথবা তাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্যে হতে পারে অথবা তাদের কাউকে কাউকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয় অথবা তাদের কোনো এক ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে গালি দেয়, আর ঐ ব্যক্তি বিশেষ হন এমন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের কুরআন-সুন্নাহ'র নস বা বক্তব্য রয়েছে অথবা তার চেয়ে নিম্ন স্তরের বর্ণনা বিদ্যমান আছে।

আপানাদের সামনে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম বা বিধানের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হলো:

প্রথমত: যে ব্যক্তি সকল সাহাবীকে অথবা অধিকাংশকে কাফির, মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বা ফাসিক বলে গালি দিবে তার বিধান হলো, যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে, সে ব্যক্তি কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আর এ কাফির হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

১. এ কথার অর্থ হলো কুরআন ও সুন্নাহর সংকলনকারীগণ কাফির বা ফাসিক। আর এ কারণে আল-কুরআন ও হাদীসসমূহের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। কারণ, সংকলনকারীদেরকে অপবাদ দেওয়ার অর্থ হলো তাদের দ্বারা সংকলিত বিষয়ে অপবাদ দেওয়া।

২. এর মধ্যে ঐ বিষয়টিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়, যে বিষয়ে কুরআন বক্তব্য পেশ করেছে। যেমন, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা এবং তাদের গুণগান করা। কারণ, 'আল-কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যসমূহ থেকে অর্জিত জ্ঞান অকাট্যভাবে তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।'[2] আর যে ব্যক্তি আকাট্য দলীলকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায়।

৩. এর মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। কারণ, তারা হলেন তার সঙ্গী-সাথী ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং তাঁর বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গালি দেওয়া এবং তাদের প্রতি অপবাদ দেওয়াটা তাকে নিঃসন্দেহে কষ্ট দেয় আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া কুফুরী যা সর্বজন স্বীকৃত।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা রহ. এ প্রকার গালির বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাপূর্বক বলেন: "আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে বলবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে তাদের (সাহাবীগণের) অল্প সংখ্যক ব্যক্তি, যাদের সংখ্যা দশ জনের বেশি হবে না, এমন সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া সকলেই মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে অথবা তারা সকলেই ফাসিক হয়ে গেছে, তবে এ ধরনের কথাও নিঃসন্দেহে তার কুফুরীর মধ্যে পড়ে। কারণ, সে আল-কুরআনের একাধিক জায়গায় প্রদত্ত বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। যেমন, তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা এবং তাদের গুণগান করা। বরং যে ব্যক্তি এ ধরনের কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে, তবে তা তার কুফুরী হিসেবে বিবেচিত হবে... তিনি বলেন: দীন ইসলামের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা থেকেই এটা কুফুরী বলে গণ্য।"[3]

হাইছামী রহ. বলেন: "অতঃপর আলোচনা বা সমালোচনা তথা বিতর্ক হলো শুধু তাদের কিছু সংখ্যককে গালি দেওয়ার ব্যাপারে, তবে তাদের সকলকে গালি দেওয়া যে নির্ভেজাল কুফুরী তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয় নেই।"[4]

আর পূর্ববর্তী পূর্ণাঙ্গ দলীলসমূহের সুস্পষ্টতা সত্ত্বেও কোনো কোনো আলেম আরও কিছু ব্যাখ্যামূলক দলীলের উল্লেখ করেন, তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ:

প্রথমত: আমাদের নিকট আলেমদের পক্ষ থেকে সূরা আল-ফাতহ'র শেষ আয়াতের যে তাফসীর উপস্থাপিত হয়েছে:

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ ... لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ ... ٢٩﴾ [الفتح : ٢٩]

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল... যাতে তিনি তাদের (মুমিনদের) সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন...।" [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

ইমাম মালেক রহ. এ আয়াত থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন, যে ব্যক্তি সাহাবীগণকে অবজ্ঞা করে, সে কাফির। কারণ, সাহাবীগণ তাদেরকে ক্রোধান্বিত করে। আর যে ব্যক্তিকে সাহাবীগণ রাগান্বিত করে, সে কাফির। আর ইমাম শাফে'ঈ রহ. ও অন্যান্যরাও তার মতো অভিমত ব্যক্ত করেন।[5]

দ্বিতীয়ত: পূর্বে আলোচিত ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. কর্তৃক সংকলিত আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار ».

"আনসারদেরকে ভালোবাসা ঈমানের লক্ষণ আর আনসারদেরকে ঘৃণা করা নিফাকীর লক্ষণ।"[6]

অপর এক বর্ণনায় আছে:

«لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق ». ...

"তাদেরকে শুধু মুমিনরাই ভালোবাসে আর তাদেরকে শুধু মুনাফিকরাই ঘৃণা করে ...।"[7]

আর ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বিশুদ্ধ সনদসহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ».

“আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান স্থাপন করে এমন কোনো লোক আনসারদেরকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করবে না।”[8]

সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরক গালি দিবে সে তাদের প্রতি আরও বেশি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল। সুতরাং তার মুনাফিক হওয়াটা আবশ্যক হয়ে যায়, যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে না।[9]

তৃতীয়ত: যা আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত। তিনি ঐ ব্যক্তিকে দোররা দ্বারা আঘাত করেছেন, যে ব্যক্তি তাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

»أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا «

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে এই এই ক্ষেত্রে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ।” অতঃপর উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

»من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري «

“যে ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম বলবে, আমরা তার ওপর ঐ শাস্তি প্রয়োগ করব, যে শাস্তি আমরা অপবাদ দানকারীর ওপর প্রয়োগ করে থাকি।”[10]

আর অনুরূপভাবে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন:

»لا يفضلني أحد على أبي بكر و عمر إلا جلدته حد المفتري «

“যে কেউ আমাকে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবে, আমি তাকে অপবাদ দানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির মতো বেত্রাঘাত করব।”[11]

সুতরাং খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্যতম দু’জন খলিফা উমার ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা যখন ঐ ব্যক্তিকে অপবাদ দানকারীর জন্য নির্ধারিত শাস্তির মতো বেত্রাঘাত করতেন, যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করত, অথবা যে ব্যক্তি উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

‘আনহু’র ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করত। অথচ শুধু একজনকে অন্যের ওপর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার মধ্যে কোনো প্রকার গালি ও দোষ নেই। সুতরাং জেনে রাখা দরকার, তাদের উভয়ের নিকট গালির শাস্তি এর চেয়ে আরও কত বেশি ভয়ানক হতে পারে![12]

দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি তাদের কাউকে গালি দেয়, সে তাদের দীনের ব্যাপারে অপবাদ দেয়

যেমন তাদেরকে কাফির বা ফাসিক বলে অপবাদ দেওয়া, যারা হচ্ছেন এমন সাহাবী, যাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুতাওয়াতির[13] পর্যায়ের নস বা বক্তব্য রয়েছে। যেমন, খলিফাগণ। এ জাতীয় কাউকে কাফির বা ফাসিক বলা বিশুদ্ধ মতে কুফরী। কারণ, এর মাধ্যমে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

আবু মুহাম্মদ ইবন আবু ইয়াযিদ রহ. সাহনূন রহ, থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি আবু বকর, উমার, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমের ব্যাপারে বলবে যে, তারা ভ্রষ্টতা ও কুফুরীর ওপর বিদ্যমান ছিল, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি তারা ব্যতীত অপরাপর সহাবীদেরকে অনুরূপ গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।”[14]

হিশাম ইবন ‘আম্মার রহ. বলেন, “আমি মালেক রহ.-কে বলতে শুনেছি “যে ব্যক্তি আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ব্যাপারে বলেন:

﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧﴾ [النور : ١٧]

“আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, ‘তোমরা যদি মুমিন হও তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবে, আর যে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নিবে, তাকে হত্যা করা হবে।”[15]

অপর এক বর্ণনায় ইমাম মালেক রহ.-এর কথা (যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে ব্যক্তি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো: কেন? তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে। বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

এখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়ার বিধান প্রশ্নে ইমাম মালেক রহ.-এর উদ্দেশ্য হলো কুফুরীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ। আর ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা’র প্রসঙ্গে তার অবশিষ্ট কথাই তা সুস্পষ্ট করে দেয়। যেমন, তিনি বলেছেন: (যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করবে, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিপক্ষে অবস্থান নেবে।) সুতরাং এটা নির্দিষ্ট গালি, যা প্রয়োগকারী কাফির হবে এবং তা সকল গালিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর এটা এ জন্য যে, মালেক রহ. থেকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে, যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে কাফির বলবে।”[16]

হাইছামী রহ. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে বলেন: হানাফীদের মতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে গালি দেওয়া কুফরী, আর শাফে‘ঈদের মতে, দু’টি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো একটিকে গ্রহণ করা। আর মালেক রহ.-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো, এর দ্বারা বেত্রাঘাত ওয়াজিব হবে। কারণ, তা কুফুরী নয়। তবে হ্যাঁ, কখনও কখনও তিনি তার এ মত থেকে বের হয়ে যান, যেমনটি তার থেকে বর্ণিত হয়েছে খারেজীদের ব্যাপারে, আর তা হলো সে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং তার নিকট মাসআলাটির দু’টি অবস্থা: “সে যদি কাফির না বলে শুধু গালির ওপর সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তিনি তাকে কাফির বলেন নি, তার ব্যতিক্রম হলে, সে কাফির হয়ে যাবে।”[17]

তিনি আরও বলেন: “আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এবং তার মত যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, তাদেরকে কাফির বলার বিধান সম্পর্কে শাফে‘ঈ মাযহাবের অনুসারীগণ কোনো কথা বলেন নি। আর তিনি এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কুফুরী বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।”[18]

আল-খুরাশী রহ. বলেন: “যে ব্যক্তি ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহাকে অপবাদের বাণে বিদ্ধ করবে, যা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিয়েছেন..., অথবা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু

‘আনহুকে সাহাবী বলে অস্বীকার করবে অথবা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত বিশেষ দশ জনের ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করবে অথবা সকল সাহাবীর ইসলাম গ্রহণকে অস্বীকার করবে অথবা প্রসিদ্ধ চারজনকে কাফির বলবে অথবা তাদের একজনকে কাফির বলবে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।”[19]

বাগদাদী রহ. বলেন: “আর তারা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন, যে ব্যক্তি সে দশ জনের কোনো একজনকে কাফির বলে, যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন, আবার তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল স্ত্রী’র পারস্পরিক বন্ধুত্বের কথা বলেন এবং তারা ঐ ব্যক্তিকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন যে ব্যক্তি তাদেরকে কাফির বলে অথবা তাদের ব্যক্তি বিশেষকে কাফির বলে।”[20]

আর এ মাসআলাটির মধ্যে খোলামেলা বিতর্ক রয়েছে; সম্ভবত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিধানটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর যারা এ পরিস্থিতিতে কাফির না হওয়ার কথা বলেন তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ করার কারণে সে ফাসিক। সাহাবীর মর্যাদা ও গালির ধরণ অনুযায়ী সে তিরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

হাইছামী রহ. বলেন: “যারা সাহাবীগণের গালিদাতাকে কাফির না হওয়ার কথা বলেন তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তারা ফাসিক।”[21]

ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন: “ইবরাহীম নখ‘ঈ রহ. বলেন: আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে গালি দেওয়াকে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত বলা হতো। অনুরূপভাবে আবু ইসহাক আস-সাবি‘ঈ বলেন: আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে গালি দেওয়াটাকে ঐসব কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِن تَجۡتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنۡهَوۡنَ عَنۡهُ﴾ [النساء : ٣١]

“যদি তোমরা ঐসব কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাক, যার থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩১]

আর তাদের গালি দেওয়ার পরিণতি যখন এ পর্যায়ের, তখন তার সর্বনিম্ন বিধান হলো তিরস্কার করা। কারণ, তার বিধান শরী'আত বিধিবদ্ধ করেছে এমন প্রতিটি অপরাধের জন্য, যার বিধানের মধ্যে হদ তথা শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি ও কাফফারার ব্যবস্থা নেই... আর এটি (হদ ও কাফফারা) এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ও তাদের যথার্থ অনুসারী তাবে'ঈগণ থেকে শুরু করে ফিকাহবিদ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কোনো বিতর্ক আছে বলে আমরা জানি না। সুতরাং তারা সকলেই এ কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ যে, উম্মতের উপর আবশ্যক হলো সাহাবীগণের গুণাবলী আলোচনা করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা... এবং যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলবে, তার শাস্তির ব্যবস্থা করা।[22]

আর কাযী 'আইয়াদ্ব বলেন: "তাদের কাউকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, আর আমাদের মাযহাব ও অধিকাংশ আলেমের মাযহাব হলো তাকে তিরস্কার করা হবে, তবে হত্যা করা হবে না।"[23]

আর আব্দুল মালেক ইবন হাবিব বলেন: "শিয়াদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে অবজ্ঞা করা ও তার থেকে মুক্ত থাকার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে, তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। আর যদি সে আরও বাড়িয়ে আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকেও অবজ্ঞা করে, তবে তার ওপর কঠোর শাস্তি প্রয়োগ হবে, বারবার তাকে প্রহার করা হবে এবং তাকে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখা হবে, শেষ পর্যন্ত সে সেখানে মারা যাবে।"[24]

সুতরাং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গালি দেওয়ার শাস্তি হিসেবে শুধু বেত্রাঘাতের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ, এ বেত্রাঘাত প্রযোজ্য হবে শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য পাওয়ার অধিকারের জন্য। সুতরাং যখন সহচর্যের সাথে অন্য আরও এমন কোনো গুণাবলী যুক্ত হয়, যা অতিরিক্ত সম্মান পাওয়ার দাবি করে; যেমন, দীন ও মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করা, তার হাতে কোনো বিজয় অর্জন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিলাফত পাওয়া ইত্যাদি, তবে এসব বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই তার ওপর কোনো ব্যক্তির স্পর্ধা দেখানোর সময় আবশ্যকীয়ভাবেই অতিরিক্ত শাস্তি দাবি করবে।[25]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "তাদের মন্দ দিকের কোনো কিছু আলোচনা-সমালোচনা করা এবং তাদের কাউকে দোষারোপ করা কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, তাকে শাস্তি দেওয়া প্রশাসকের ওপর আবশ্যক হয়ে পড়বে, তাকে ক্ষমা করার অধিকার তার (প্রশাসকের) নেই; বরং তিনি তাকে শাস্তি দিবেন এবং তাকে তাওবা করতে বলবেন। অতঃপর সে যদি তাওবা করে, তবে তিনি তা গ্রহণ করবেন। আর যদি সে তার কথায় অটল থাকে, তবে তাকে পুনরায় শাস্তি দিবেন এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিবেন, শেষ পর্যন্ত সে সেখানে মারা যাবে অথবা সংশোধন হয়ে ফিরে আসবে।"[26]

সুতরাং মুসলিম ভাই আমার! যে ব্যক্তি তাদের কাউকে দোষারোপ করে অথবা কাউকে নিন্দা করে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমামের কথার প্রতি লক্ষ্য করুন, আরও লক্ষ্য করুন আবশ্যকীয়ভাবে তার ওপর শাস্তির বিধানের প্রতি। আর যখন কোনো কোনো ইমামের নিকট তাদেরকে উল্লিখিত গালি দেওয়াটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে গালিদাতার হুকুম হবে কুফুরীর মতো অপরাধকে বৈধ বিবেচনাকারীর মতো কবীরা গুনাহ করা ব্যক্তির হুকুমের মতো।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন 'আবদিল ওহহাব রহ. সাহাবীগণকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করার বিধান স্পষ্ট করে বলেন: "আর যে ব্যক্তি তাদের কিছু সংখ্যককে গালির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে অতঃপর তিনি যদি এমন সাহাবী হন, যার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে মুতাওয়াতির বর্ণনা রয়েছে। যেমন, খলিফাগণ। এমতাবস্থায় গালিদাতা যদি বিশ্বাস করে যে, তাকে গালি দেওয়ার অধিকার তার রয়েছে অথবা সে গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত আছে তাকে (সাহাবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে, মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাফির বলে গণ্য হবে। আর সে যদি তাকে গালি দেওয়ার অধিকার তার রয়েছে বলে মনে না করে তাকে গালি দেয় অথবা গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে না করে, তবে সে ফাসিক হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়াটা ফাসেকী বা অন্যায়। কোনো কোনো আলেম ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কাফির বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে ব্যক্তি শায়খাইন তথা আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে সাধারণভাবে যে কোনো প্রকার গালি প্রদান করে।"[27]

যে ব্যক্তি তাদের কাউকে গালি দেয়, তার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলোচনার সারকথা হলো, সে তার দীন ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করল, আর তিনি যদি এমন সাহাবী হন, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, তবে সে (অভিযোগকারী) মুতাওয়াতির পর্যায়ের

বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতের ভিত্তিতে কাফির হয়ে যাবে। তবে যাকে আলেমগণ কাফির বলে আখ্যায়িত করেন নি, তার ব্যাপারে তাদের ঐক্যবদ্ধ মতো হলো -সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত একজন এবং সে তিরস্কার ও শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর ইমামের জন্য তাকে ক্ষমা করা বৈধ হবে না। আর সাহাবীর মর্যাদার অবস্থান অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। আর তাদের মতে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির হবে না, যতক্ষণ না সে তাদেরকে গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করবে। তবে যে ব্যক্তি গালি দেওয়াটাকে বৈধ মনে করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করবে। যেমন, গালি দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হবে মনে করবে, তাহলে সে এমন পর্যায়ের কাফির হবে, যে ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্য সুস্পষ্ট।

আল্লাহ চাহে তো এ প্রকারের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রকার খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ জন্যই আমরা এ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত করেছি।

তৃতীয়ত: আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দেওয়ার বিধান:

যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে এমন বিষয় দ্বারা গালি দিবে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞজন তথা আলেমদের ঐক্যবদ্ধ মতামত হলো, সে কাফির হয়ে যাবে।

কাযী আবু ইয়া'লা রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে এমন বিষয়ে অপবাদ দিবে যা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন, সে ব্যক্তি কোনো প্রকার বিতর্ক ছাড়াই কাফির হয়ে যাবে।" আর এ ব্যাপারে একাধিক ইজমা সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একাধিক ইমাম এ হুকুম বা বিধানটিকে সুস্পষ্ট করেছেন। ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হবে, আর যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে গালি দিবে, সে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হলো, কেন? তখন তিনি বললেন: যে ব্যক্তি তার প্রতি অপবাদ বা অভিযোগের বাণ নিক্ষেপ করল, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের বিরোধিতা করল।"[28]

আর ইবনু শা'বান রহ. তার এক বর্ণনায় বলেন, মালেক রহ. থেকে তা বর্ণিত আছে, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٧﴾ [النور : ١٧]

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, 'তোমরা যদি মুমিন হও, তবে কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।[29]

যে ব্যক্তি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে অপবাদ দিবে, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রদত্ত দলীলসমূহ সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি:

১. প্রথমত: ইমাম মালেক রহ. যার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর মধ্যে আল-কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যে কুরআন তাঁর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। আর আল-কুরআন যা নিয়ে এসেছে, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফুরী।

ইমাম ইবনু কাছীর রহ. বলেন: "আলেমগণ ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন, যে ব্যক্তি এর পরেও তাকে গালি দিবে এবং এই আয়াতের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরেও তাকে এর দ্বারা অপবাদ দিবে, যার দ্বারা তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে আল-কুরআন বিরোধী।"[30]

ইবন হাযম রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর পূর্বের কথার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন: "এখানে ইমাম মালেক রহ.-এর কথা সহীহ। আর তা হলো আয়াতকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাকে (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে) অকাট্যভাবে নির্দোষ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।"[31]

২. দ্বিতীয়ত: এর মাধ্যমে বিভিন্ন কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া ও তাঁর মানহানির বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীম প্রমাণ পেশ করেছে। আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤﴾ [النور : ٤]

“আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি কশাঘাত কর এবং তোমরা কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো ফাসিক।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩] এবং তাঁর বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٣﴾ [النور : ٢٣]

“যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-উদাস, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৩]-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় বলেন: এ আয়াতটি বিশেষ করে ‘আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের শানে অবতীর্ণ। আর তাতে তাওবার বিষয় নেই। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য তার বক্তব্যের শেষের দিকে তাওবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সুতরাং ব্যক্তি আপেক্ষিভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, অতঃপর সর্বোত্তম ব্যাখ্যাটি মাথা পেতে গ্রহণ করবে।”[32]

সুতরাং আব্দুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ও মুমিন জননীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। কারণ, তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অপবাদ ও দোষারোপের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা, নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, যেমনিভাবে তা তার ছেলে-সন্তানকে কষ্ট দেয়। কারণ, তা তাকে দাইউছের[33] সাথে সম্পর্কিত করে এবং তার দাম্পত্য জীবনে বিশৃঙ্খলার প্রকাশ ঘটায়। আর নিশ্চয় তার স্ত্রীর ব্যভিচার তাকে ভীষন কষ্ট দেয়... এবং সম্ভবত কোনো কোনো মানুষের সাথে তার পরিবারের প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে যে লজ্জা ও অসম্মান সম্পৃক্ত হয়, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাস্তবে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য।[34] সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরী।

ইমাম কুরতুবী রহ. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثۡلِهِۦٓ أَبَدًا﴾ [النور : ١٧]

"আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো যাতে অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ১৭] প্রসঙ্গে বলেছেন: এ আয়াতটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (অর্থাৎ তার ব্যাপারে যাতে তোমরা অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি না কর) কারণ, অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি বলতে যার সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে অবিকল সে কথার মতো পুনরায় কথা বলাকেই বুঝায় অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যিনি তার মর্যাদায় ছিলেন, তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মানসম্মান ও পরিবারকে নিয়ে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, এটা তার পক্ষ থেকে কুফুরী বলে গণ্য হবে।[35]

আর যা প্রমাণ করে যে, তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কারণ, তা ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. তাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে ইফকের ঘটনা সংবলিত হাদীসে বর্ণনা করেছেন। 'আয়শো রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

... »فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: « يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِى أَهْلِ بَيْتِى .« ...

"...অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে?..."[36]

সুতরাং তার কথা: (مَنْ يَعْذِرُنِى) অর্থাৎ যখন আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করেছে, আর আমি তার থেকে প্রতিকার চাই, তখন কে আমার প্রতি ইনসাফ করবে এবং তার প্রতিকার করবে। আর আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা খুবই কষ্ট পেয়েছেন এবং তার ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আর যেসব মুমিন উত্তেজিত হয় নি, তারা বললেন: আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিন, আমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিব। সুতরাং আমরা আপনাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করব, যখন আপনি আমাদেরকে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিবেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দের কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, যখন সে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ চেয়েছেন।[37]

শাইখ মুহাম্মদ ইবন আবদিল ওহ্হাব রহ. বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে পবিত্রতমা (যা তার থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত) উম্মুল মুমিনীন জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, তবে সে হবে মুনাফিকদের প্রধান আব্দুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুলের কাতারের লোক। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলার ভাষা হলো: 'মুসলিম সমাজ! আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٥٧ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٥٨﴾ [الاحزاب : ٥٧، ٥٨]

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করে নি তার জন্য। নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৭-৫৮]

সুতরাং কোথায় তাঁর দীনের সাহায্যকারীগণ, যারা তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করব।"[38]

যেমনিভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করার মধ্যে অপর দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদাহানির বিষয় রয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ ...﴾ [النور : ٢٦]

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য ...।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬]

ইবন কাছীর রহ. বলেন: "আল্লাহ তা'আলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে পবিত্র অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী বানিয়েছেন। কারণ, তিনি হলেন পবিত্র মানুষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পবিত্রতম, আর তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) যদি দুশ্চরিত্রা নারী হতেন (না'উযুবিল্লাহ), তবে তিনি শর'ঈ ও মর্যাদার দিক বিবেচনায় তাঁর (রাসূলের) জন্য উপযুক্ত হতেন না। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَۖ ﴾ [النور : ٢٦]

"লোকেরা যা বলে তার সাথে তারা সম্পর্কহীন।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬] অর্থাৎ মিথ্যাবাদী ও সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী যা বলে, তারা তার থেকে সমপূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।"[39]

চতুর্থত: অবশিষ্ট মুমিন জননীদেরকে গালি দেওয়ার বিধান:

অবশিষ্ট মুমিন জননীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার বিধানের ক্ষেত্র আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে অধিকাংশের নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হলো এ ধরনের আচরণকারী কাফির। কারণ, অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আর আল্লাহ তা'আলা তার (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) জন্য রাগান্বিত হয়েছেন। কেননা তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। সুতরাং তিনি (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা) এবং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ সকলেই আইনের চোখে সমান।[40]

অনুরূপভাবে আরেকটি কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মধ্যে তাঁর জন্য মর্যাদাহানি ও কষ্টের কারণ নিহিত রয়েছে।[41] যার বর্ণনা আমরা করেছি 'যে ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, তার বিধান আলোচনা করার সময়।' তবে এ অপবাদ ব্যতীত মুমিন জননীদেরকে গালি দিলে, তখন তাদের বিধান হবে অপরাপর সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার বিধানের মতো, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

পঞ্চমত: যে সাহাবীর মর্যাদা মুতাওয়াতির বর্ণনার দ্বারা সাব্যস্ত হয় নি, তাকে এমন গালি দেওয়া, যা তাঁর দীনে আঘাত করে:

যে ব্যক্তি এমন কোনো সাহাবীকে গালি দেয়, দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, সে গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মতামতটি আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা আসে নি, তাকে যে ব্যক্তি গালি দিবে, অধিকাংশ আলেমের মতে সে কাফির হবে না। আর এটা এ জন্য যে, তার দ্বারা দীনের আবশ্যকীয়ভাবে জ্ঞাত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা হয় না, তবে তাকে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তথা সহচর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গালি দেওয়া হয়, তবে গালিদাতা কাফির হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ‘আবদিল ওহ্হাব রহ. বলেছেন: “যদি তিনি এমন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হন, যার মর্যাদা ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা আসে নি, তাহলে পরিষ্কাভাবে ঐ সাহাবীকে গালিদাতা ফাসিক বলে গণ্য হবে, তবে তাকে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সহচর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গালি দেওয়া হয়, তবে গালিদাতা কাফির হয়ে যাবে।”[42]

ষষ্ঠত: তাদের কাউকে এমন গালি দেওয়া, যা তাদের দীন ও ন্যায়পরায়ণতায় আঘাত করে না:

কোনো সন্দেহ নেই যে, এমন কাজ যে করবে, সে তিরস্কার ও শাস্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আমরা অধ্যয়ন বা অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, উল্লিখিত তথ্যপঞ্জিতে আলেমদের উক্তিসমূহতে আমরা তাদের মধ্য থেকে একজনকেও এরূপ গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করতে দেখি নি আর এ ব্যাপারে তাদের মতে সাহাবীগণের মধ্যে বড় বা ছোট বলে কোনো পার্থক্য নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন: “তবে যদি সে তাদেরকে এমন গালি দেয়, যা তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও দীনকে কলুষিত করে না। যেমন, তাদের কাউকে কৃপণ বলা অথবা কাপুরুষ বলা অথবা অল্প বিদ্যান বলে আখ্যায়িত করা অথবা দুনিয়াদার বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি, তবে সে তিরস্কার ও শাস্তির অধিকারী হবে। আর শুধু এ কারণে আমরা তাকে

কাফির বলে ফতোয়া দিব না। আর এ যুক্তির ওপর নির্ভর করছে ঐ ব্যক্তির কথা, আলেমদের মধ্য থেকে যিনি তাকে (এ কারণে) কাফির বলে আখ্যায়িত করেন না।”[43]

আবু ই‘য়ালা রহ. কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, যাতে রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে স্বল্প জ্ঞানের দোষে দোষারোপ করা হয়েছে।[44]

আর অনুরূপ বিধানই প্রযোজ্য হবে তার প্রতি যে তাদেরকে দুর্বল সিদ্ধান্ত, দুর্বল ব্যক্তিত্ব, অলসতা, দুনিয়ালোভী ইত্যাদি দোষে দোষারোপ করবে। বস্তুত এ প্রকারের অপবাদ দ্বারা ইতিহাসের কিতাবগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাতের সাথে সম্পর্কিত সাম্প্রতিক শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীলতা ও পাঠ পদ্ধতির নামে এসব অপবাদে ভরপুর হয়ে আছে। মূলত এ প্রকারের অধিকাংশ শিক্ষায় প্রাচ্যবিদদের একটা প্রভাব রয়েছে।

সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ

আশা করা যায় এখানে খুবই সংক্ষিপ্ত একটি অনুচ্ছেদের অবতারণা করাটা যথাযথ হবে, তাতে আমরা এ পদ্ধতির ভুল-ভ্রান্তিগুলো বর্ণনা করব। আরও তুলে ধরব সাহাবীগণের ইতিহাসের সাথে তার সমন্বয়সাধনের ভয়ঙ্কর দিকগুলো।

পাশ্চাত্যবিদগণের নিকট সৃজনশীল পদ্ধতি মানে বিষয়বস্তু নিয়ে ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরে গিয়ে শুধু বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা ও গবেষণা করা।[45]

সুতরাং আমরা এর জবাবস্বরূপ বলব:

প্রথমত: মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতিতেই তার আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়, তবে সে তার বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেই তা সম্ভব হবে।[46]

দ্বিতীয়ত: ইসলামের ইতিহাসের ব্যাপারটিও অনুরূপ, যখন ঘটনাসমূহ সাব্যস্ত হবে বর্ণনা সমীক্ষার মানদণ্ডে, তখন আমরা কোন পদ্ধতিতে তা অনুধাবন করব এবং ব্যাখ্যা করব? যখন আমরা ইসলামী পদ্ধতিতে তা ব্যাখ্যা করব না, তখন অবশ্যই আমরা অপর একটি পদ্ধতি

পছন্দ করব। ফলে আমরা এমনভাবে বিকৃতির মধ্যে পতিত হব যে, আমরা জানতেই পারব না।

সুতরাং এর ওপর ভিত্তি করে আমাদের আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো, আমরা সাহাবীগণের ইতিহাসের সাথে এ পদ্ধতিটির সমন্বয়সাধনের সময় সতর্কতা অবলম্বন করব। আর যার মাধ্যমে আমি আমার নিজেকে এবং আমার গবেষক ভাইদেরকে সাহাবীগণের ইতিহাসের ব্যাপারে যে উপদেশ দিচ্ছি তা হলো, তারা যেন তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরে না যায়। আর সে আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে অন্যতম দিক হলো সাহাবীগণের 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আস্থা পোষণ করা, তাদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার সময় তাদেরকে গালি দেওয়া হারাম মনে করা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা; যেহেতু তাদের মাধ্যমে ইসলাম এসেছে। আর তাদের জেনে রাখা উচিত, নিশ্চয়ই ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আহলে সুন্নাতের একটি স্পষ্ট পদ্ধতি রয়েছে, যে ব্যাপারে শেষের দিকে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সহাবীগণকে গালি দেওয়ার অপরিহার্য পরিণতি

সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী নেক বান্দাগণ সাহাবীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ এবং তাদেরকে গালি দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং অপবাদদানকারী ও তাদের উদ্দেশ্য থেকে সতর্ক করেছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে এ গালি দীনের মূলনীতিকে যে অপরিহার্য অসঙ্গতির দিকে ধাবিত করবে, সে সম্পর্কে তাদের জানা থাকার কারণে। সুতরাং তাদের কেউ কেউ কম কথা বলেছেন; কিন্তু সে কথাগুলো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, সে কথাগুলো এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করব। অতঃপর কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করব যা সচরাচর গালির সাথে সম্পৃক্ত।

সকল সাহাবী অথবা তাদের অধিকাংশকে কুফুরী বা ফাসেকীর সাথে সম্পর্কিত করে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের গালি দান অথবা খোলাফায়ে রাশেদীনের মতো কোনো সাহাবী, যার মর্যাদার ব্যাপারে মুতাওয়াতির পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে, তার ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রদত্ত অপবাদের যুক্তি খণ্ডন প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্যগুলো এখানে একত্রিত করব।

ইমাম মালেক রহ. যেসব ব্যক্তি সাহাবীগণকে গালি দেয়, তাদের সম্পর্কে বলেন, "তারা এমন সম্প্রদায়, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের মধ্যে কালিমা লেপন করতে চেয়েছে; কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয় নি। অতঃপর তারা তাঁর সাহাবীগণের ব্যাপারে দূর্নাম

করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মন্দ ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছে, তারা চায় এটা বলতে যে, সে যদি সৎব্যক্তি হত, তবে তাঁর সাহাবীগণও সৎ হতেন।"[47] [না'উযুবিল্লাহ]

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, "যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে সাহাবীগণের মধ্য থেকে কারও ব্যাপারে মন্দ সমালোচনা করতে দেখবে, তখন তুমি তাকে সন্দেহ করবে যে, সে মুসলিম কিনা।"[48]

আবু যুর'আ আর-রাযী রহ. বলেন, "যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে কারও মর্যাদাহানি করতে দেখবে তখন তুমি জেনে রাখবে যে, সে হলো নাস্তিক আর এটা এ জন্য যে, আমাদের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য এবং আল-কুরআন সত্য; আর এ কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে (শ্রেষ্ঠ মানুষ) হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। আর তারা চাচ্ছে আমাদের সাক্ষীদেরকে (সাহাবীগণকে) বিতর্কিত করতে, যাতে তারা কুরআন ও সুন্নাহকে বাতিল করতে পারে। আর এ লক্ষ্যে তাদের জন্য উত্তম কৌশল হলো দূর্নাম রটনার মাধ্যমে তাদেরকে বিতর্কিত করা। সুতরাং তারা হলো নাস্তিক।"[49]

আর ইমাম আবু না'ঈম রহ. বলেন, "সুতরাং কেউ যেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তির পিছনে না লাগে; বরং সে যেন তাদের পক্ষ থেকে রাগান্বিত অবস্থায় মনের অজান্তে তাঁর দীনের ব্যাপারে মন্দ কিছু হয়ে থাকলে, সে ব্যাপারে তাদেরকে হিফাযত করে।"[50]

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি তার জিহ্বাকে তাদের ব্যাপারে মন্দ উদ্দেশ্যে সম্প্রসারিত করবে, আমি তার জিহ্বাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবীগণ, ইসলাম ও মুসলিমগণ থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেব।"[51]

এখানে আলেমদের সতর্ককরণের বিষয়টি ব্যাপক, যা সকল সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর চিন্তা করুন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের কথা, "...সাহাবীগণের মধ্যে কোনো একজনের ব্যাপারে মন্দ সমালোচনা করবে..." এবং আবু যুর'আ-এর কথা: "...আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কারও মর্যাদাহানি করতে দেখবে..."। সুতরাং তারা সতর্ক করেছেন শুধুমাত্র মর্যাদাহানিকরণ

অথবা মন্দ সমালোচনা করা থেকে। যা গালি অথবা কাফির বলার চেয়ে নিম্নমানের অপরাধ। আর এ কথাগুলো ইমামগণ বলেছেন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কোনো একজনের ব্যাপারে যে কেউ এ ধরণের কাজ করবে তার ব্যাপারে, সকল সাহাবীর ব্যাপারে নয়। সুতরাং তাকে কী বলা হবে, যে ব্যক্তি তাদের অধিকাংশকে গালি দেয়?

গালির অপরিহার্য পরিণতির কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা আমার পাঠক ভাইয়ের সামনে পেশ করা হলো:

প্রথমত: সাহাবীগণকে গালিদানকারীর কথার ওপর ভিত্তি করে অল্প সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অধিকাংশ সাহাবী কাফির, মুরতাদ বা ফাসিক হয়ে যাওয়াটা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আরও আবশ্যক হয়ে পড়ে আল-কুরআনুল কারীম ও হাদীসে নববীর মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া। আর এটি এ জন্য যে, সংকলনকারীগণ অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, সংকলিত বিষয় বা বস্তুও সে অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ, কীভাবে আমরা এমন একটি কিতাবের ওপর আস্থা রাখব, যে কিতাবটি আমাদের পর্যন্ত বহন করে নিয়ে এসেছে ফাসিক ও মুরতাদগণ (না'উযুবিল্লাহ)। আর এ জন্যই সাহাবীগণকে গালি দানকারী কিছুসংখ্যক পথভ্রষ্ট ও বিদ'আতের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ স্পষ্ট করে বলে যে, সাহাবীগণ আল-কুরআনকে বিকৃত করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ এটাকে গোপন করেছেন। আর তাদের দাবী অনুযায়ী হাদীসে নববীর বেলায়ও অনুরূপটি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে; কারণ যখন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে তাদের 'আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে দোষারোপ করা হয়, তখন সনদসমূহ মুরসাল বা মাকতু' হয়ে যায়, যা সে ব্যাপারে দলীল হতে পারে না। এ সত্ত্বেও তাদের কেউ কেউ আল-কুরআনের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের কথা বলে। অতএব, আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলব: আল-কুরআনের প্রতি ঈমান থেকে আবশ্যক হয়ে পড়ে তার মধ্যে যা কিছু আছে তার প্রতি ঈমান স্থাপন করা। আর আমরা জানি যে, তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা হলো: সাহাবীগণ হলেন শ্রেষ্ঠ উম্মত বা জাতি, আল্লাহ তাদেরকে অপমানিত করবেন না এবং তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে এ তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করবে না, সে ব্যক্তি আল-কুরআনের মধ্যে যা কিছু আছে তাতে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং তার প্রতি বিশ্বাস লঙ্ঘনকারী।

দ্বিতীয়ত: গালি দানকারীদের এ কথা দাবি করে যে, নিশ্চয় এ জাতি হলো (না'উযুবিল্লাহ) নিকৃষ্ট জাতি, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণে প্রেরণ করা হয়েছে; আর এ জাতির পূর্ববর্তীগণ হলো জাতির নিকৃষ্ট সন্তান। আর জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হলো প্রথম শতাব্দীর প্রজন্ম, তাদের

সকলেই ছিল কাফির অথবা ফাসিক এবং নিশ্চয়ই তারা হলো সকল শতাব্দীর নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[52]

তাদের মুখ থেকে কত জঘন্য কথা বের হয়, এরা তো শুধু মিথ্যাই বলে।

তৃতীয়ত: এ কথা থেকে দু'টি বিষয়ের কোনো একটি আবশ্যক হয়: তাদের কথা থেকে হয় আল্লাহ তা'আলার সাথে মূর্খতার সম্পর্ক যুক্ত হয়ে যায়, অথবা (আল-কুরআনের) এসব বক্তব্যে তিনি সাহাবীগণের ব্যাপারে যে প্রশংসা ও গুণগান করেছেন, তা নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের কথা না জেনে থাকেন যে, তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে এবং তা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রশংসা ও গুণগান করেছেন এবং তাদেরকে উত্তম প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তবে তা হলো এক ধরনের মূর্খতা আর আল্লাহ তা'আলার ওপর মূর্খতার অভিযোগ আনা অসম্ভব। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা যদি জানেন যে, তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে, তবে তাদের জন্য তাঁর উত্তম প্রতিশ্রুতি এবং তাদের ওপর তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো অর্থই হয় না। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিরর্থক কোনো কাজ হওয়া একেবারেই অসম্ভব।[53]

তাছাড়া এ অপবাদ বা অভিযোগ আল্লাহ তা'আলার হিকমত বা কর্মকৌশলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যেমন তিনি তাদেরকে পছন্দ ও বাছাই করেছেন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্যের জন্য। অতঃপর তারা তাঁর সাথে জিহাদ করেছেন, তাকে শক্তি যুগিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন, আর তিনি তাদেরকে তাঁর আত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমনকি তিনি তাঁর দুই কন্যাকে যূন-নূরাইন উসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার কন্যাদ্বয়কে বিয়ে করেছেন। সুতরাং তারা অচিরেই কাফির হয়ে যাবে (যেমনটি অপবাদ দানকারীরা বলে থাকে) -এ কথা তাঁর জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তাদেরকে সাহায্যকারী ও আত্মীয়-স্বজন হিসেবে মনোনীত করেছেন?

চতুর্থত: সাহাবীগণকে প্রশিক্ষণ দানের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহে চরিত্রে, ত্যাগ-তিতিক্ষায়, তপস্যায় এবং তাকওয়া বা ধার্মিকতায় একটি আদর্শ সমাজ গঠিত হয়েছে। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক বা প্রশিক্ষক।

কিন্তু (গালির অপরিহার্য পরিণতি) অবস্থাকে তার বিপরীত করে দেয়। কারণ, যে জামা'আতটি ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দাবি করে, তারা এ সমাজের জন্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটা রূপরেখা পেশ করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ময়দানে যেসব চেষ্টা-সাধনা ও কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা ধ্বংস করে এবং তাঁর ওপর ব্যর্থতার এমন অভিযোগ চাপিয়ে দেয়, যা নিয়ে কোনো সংস্কারক বা প্রশিক্ষক তাঁর মুখোমুখি হয় নি। একনিষ্ঠ সংবাদ বাহক হিসেবে তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট ছিলেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি...।[54]

আর ইমামীয়া শিয়ারা (বর্তমান সময়ের ইরান, ইরাকের শিয়ারা) মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জোর-জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী তা শুধু তিনজন অথবা চারজনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর পর্যন্ত ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বাকিরা তাঁর মৃত্যুর পর পরেই ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে (না'উযুবিল্লাহ) এবং তারা দাবী করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য ও তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে এবং তার কোনো প্রকার প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় নি।

আর এ ধারণা মানবতার সংস্কারের ক্ষেত্রে হতাশাজনক অবস্থার দিকে নিয়ে যায়, আরও নিয়ে যায় ইসলামী জীবন পদ্ধতি এবং শিক্ষাদান ও নৈতিক চরিত্র গঠনে তার শক্তি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের দিকে, অনুরূপভাবে এ ধারণা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে সন্দেহের দিকে নিয়ে যায়; কারণ তাদের দাবীর অত্যাবশ্যক পরিণতি দাঁড়ায়, যে দীন বিশ্বের জন্য হাতে গোণা কয়েকজন বাস্তববাদী সফল আদর্শ নেতা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় নি, আরও সক্ষম হয় নি দা'ঈ বা আহ্বায়ক ও তার রিসালাতের প্রথম দায়িত্বশীলের যুগেই একটি আদর্শ সমাজ উপহার দিতে; তাহলে কীভাবে নবুওয়াতের যুগ থেকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার এ অনুসারীগণ তা দিতে সক্ষম হবে?!

আর (অপবাদদানকারীদের দাবী অনুযায়ী) যখন এ দা'ওয়াতের প্রতি বিশ্বাসীগণ যথাযথ ঐকান্তিকতার ওপর অটল থাকতে সক্ষম হয় নি এবং তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান বন্ধুর নিকট চলে যাবার পরে তাঁর দেওয়া অঙ্গীকারগুলো অনুশীলন করে নি, যে সঠিক পথের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারীদেরকে রেখে গেছেন সে পথের ওপর শুধু চারজন ব্যতীত আর কেউ অটল থাকতে পারে নি। সুতরাং

কীভাবে আমরা মেনে নেব যে, এ দীন আত্মার পরিশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযুক্ত ভূমিকা রাখতে পারবে? আর কীভাবে তা মানুষকে বিশৃঙ্খলা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দিতে এবং তাকে মানবতার শিখরে উঠাতে সক্ষম হবে? বরং কখনও কখনও বলা হয়, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবুওয়াতে সত্যবাদী হতেন, তাহলে তাঁর শিক্ষাসমূহও প্রভাব বিস্তারকারী হত, সেখানে এমন কাউকে পাওয়া যেত, যে তাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করত এবং তাদের বিশাল সংখ্যার মধ্য থেকে এমন অনেককে পাওয়া যেত, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত এবং ঈমানের ওপর অটল থাকত। সুতরাং তাঁর সাহাবীগণ যদি কয়েকজন ব্যতীত বাকি সকলেই তাদের ধারণা অনুযায়ী মুনাফিক ও মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যেত, তাহলে কে ইসলামকে অব্যাহত রাখবে? আর কোন ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা উপকৃত হবে? আর কীভাবেই বা তিনি জগতসমূহের জন্য রহমত (রাহমাতুল লিল 'আলামীন) বলে বিবেচিত হবেন?![55]

[1] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬১

[2] আর-রাদ্দু 'আলা আর-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

[3] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬, ৫৮৭

[4] হাইছামী, আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিকা, পৃষ্ঠা ৩৭৯

[5] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩১৭; তাফসীরে ইবন কাছীর: ৪/২০৪; খাল্লালের 'আস-সুন্নাহ' এর মধ্যে খবরটি সনদসহ আছে, পৃষ্ঠা ৪৭৮, নং (৭৬০), বিশ্লেষণ: ড. 'আতিয়াতুয যাহরানী।

[6] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫

[7] সহীহ বুখারী: ৭/১১৩; সহীহ মুসলিম: ১/৮৫ (হাদিসটি বারা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত)।

[8] সহীহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: আনসার ও আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে ভালোবাসা ঈমান ও তার নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের অবজ্ঞা করাটা নিফাকীর লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দলীল, হাদীস নং ২৪৪

[9] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮১

[10] ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৩০০; ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা আস-সারিমুল মাসলুল এর মধ্যে হাদীসটি বা আছারটিকে সহীহ বলেছেন: পৃষ্ঠা ৫৮৫

[11] ইমাম আহমদ, ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৮৩; ইবনু আবি 'আসিম, 'আস-সুন্নাহ': ২/৫৮৫, হেকাম ইবন জাহলের সনদে বর্ণিত, তার সনদটি আবূ 'ওবায়দা ইবনুল হেকামের দুর্বলতার কারণে দুর্বল। দেখুন: ফাযায়েলুস সাহাবা: ১/৮৩; কিন্তু তার কতিপয় প্রত্যয়নকারী (شواهد) সনদ রয়েছে, তন্মধ্যে ইবন আবি 'আসিমের মতে একটি হলো 'আলী থেকে 'আলকামা -এ সনদে, 'আস-সুন্নাহ': ২/৪৮, আলবানী তার সনদকে হাসান বলেছেন, আর আল-লালকায়ী'র (৭/১২৯৫) মতে- অপর সনদটি হলো: 'আলী থেকে সুওয়াঈদ ইবন গাফালা।

[12] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬

[13] কোনো কোনো আলেম এর দ্বারা খলিফাদেরকে নির্দিষ্ট করে থাকেন, আবার কেউ কেউ এর দ্বারা আবূ বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। আর আলেমদের মধ্যে কেউ আছেন এমন, যিনি গালির বিধানের মধ্যে তারতম্য করেন এমন বিবেচনায়, যার মর্যাদার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র নস বা বক্তব্য মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে অথবা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নিত হয় নি, আর সম্ভবত তার পরিসংখ্যান খুবই কাছাকাছি, আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। আর অনুরূপভাবে কেউ কেউ খোলাফায়ে রাশেদীনের গালিদাতাকে কাফির বলে আখ্যায়িত করার বিষয়টিকে তাদের প্রতি কুফুরের অভিযোগ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন (অর্থাৎ তাদেরকে কাফির বললেই সে কাফির হবে); আর বাকি সাহাবীদের কাউকে গালি দিলে, তা হবে অপবাদ দেওয়ার শামিল। [অর্থাৎ তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ হবে] (দ্র. মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ আল-ওয়াহাইবী, 'ই'তিকাদু আহলে সুন্নাহ ফিস্ সাহাবা'।

[14] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা: বিশ্লেষণ: আলী-বাজাবী, ২/১১০৯

[15] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৪

[16] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা (الشفا), বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯

[17] আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৬

[18] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৫

[19] আল-খুরাশী 'আলা মুখতাসারিন খলীল: ৮/৭৪

[20] আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, বিশ্লেষণ: মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আব্দুল হামিদ, পৃষ্ঠা ৩৬০

[21] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৩

[22] আল-লালকায়ী, শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাত ৮/১২৬২, ১২৬৬; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭৮

[23] সহীহ মুসলিম, ইমাম নাওয়াওয়ীর ব্যাখ্যাসহ: ১২/৯৩

[24] কাযী 'আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আলী আল-বাজাবী, ২/১১০৯; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬৯

[25] আস-সাওয়া'য়েক আল-মুহরিক্কা, পৃষ্ঠা ৩৮৭

[26] ত্ববকাতুল হানাবেলা, ১/২৪; আস-সারিমুল মাসলুল পৃষ্ঠা ৫৬৮

[27] আর-রাদ্দু 'আলার-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

[28] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৬৫, ৫৬৬, আর খবরটি সনদসহ আল-মুহাল্লা (المحلى)-এর মধ্যে রয়েছে: ১১/৪১৪, ৪১৫

[29] কাযী ‘আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯

[30] দেখুন, তাফসীরু ইবন কাছীর: ৩/২৭৬; আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾ [النور: ٢٣]

“যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা-উদাস, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৩]-এর ব্যাখ্যায়।

[31] আল-মুহাল্লা (المحلى): ১১/৪১৫
[32] দেখুন: ইবনু জারীর, ১৮/৮৩; আর তার থেকে ইবন কাছীর, ৩/২৭৭

[33] দাইউছ (ديوث) হল: স্ত্রীর ব্যভিচারে নির্লিপ্ত স্বামী।

[34] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৪৫; কুরতুবী: ১২/১৩৯, মুদ্রণ: দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা।

[35] কুরতুবী: ২/১৩৬, ২৩৭; ইবনুল ‘আরাবী থেকে বর্ণিত, আহকামুল কুরআন: ৩/১৩৫৫, ১৩৫৬, বিশ্লেষণ: বুখারী।

[36] সহীহ বুখারী, শাহাদাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান, হাদীস নং ২৫১৮; সহীহ মুসলিম, তাওবা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ইফকের ঘটনা ও অপবাদ দানকারীর তাওবা কবুল প্রসঙ্গে, হাদিস নং-৭১৯৬

[37] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯ সংক্ষেপ করার মাধ্যমে উদ্ধৃত।

[38] রিসালাতুন ফির রদ্দি ‘আলার রাফিযা: ২৫, ২৬

[39] ইবন কাছীর: ৩/২৭৮

[40] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/৯৫

[41] কাযী ‘আইয়াদ্ব, আশ-শিফা, বিশ্লেষণ: আল-বাজাবী, ২/১১০৯; আরও দেখুন: আস-সাওয়ায়েক আল-মুহরিক্বা, পৃষ্ঠা ৩৮৭; আল-মুহাল্লা: ১১/৪১৫

[42] আর-রাদ্দু ‘আলা আর-রাফেদা, পৃষ্ঠা ১৯

[43] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৬

[44] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৭১

[45] দেখুন: ‘উলইয়ানী, মানহাজু কিতাবাতুত তারীখ, পৃষ্ঠা ১৩৮

[46] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: ডক্টর মুহাম্মদ রাশাদ খলিল, ‘ফীর রাদ্দে ‘আলা দা‘ওয়াল মাওদু‘য়ীইয়্যা’: ৩৪-৩৭

[47] ‘সাহাবীদেরকে গালি দেওয়ার বিধান’ প্রসঙ্গে পুস্তিকা, পৃষ্ঠা ৪৬; আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮০ থেকে সংকলিত।

[48] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৮/১৪২; আরও দেখুন: আল-মাসায়েল ওয়ার রাসায়েল, যাতে ইমাম আহমাদের আকীদা বিষয়ক বর্ণনা জমা করা হয়েছে। মুদ্রণ: দারু তায়্যিবা, ২/৩৬৩, ৩৬৪

[49] খতিব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়া, পৃষ্ঠা ৯৭

[50] আবু না‘ঈম, ইমামত, পৃষ্ঠা ৩৪৪

[51] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭৬

[52] আস-সারিমুল মাসলুল, পৃষ্ঠা ৫৮৭

[53] দেখুন: মুহাম্মদ ইবনুল ‘আরাবী আত-তাবানী, ইত্তিহাফু যবিউন নাজাবা, দারুল আনসার, পৃষ্ঠা ৭৫

[54] ঐসব বড় বড় কল্পনাবিলাসী, অপবাদদানকারী ও পথভ্রষ্টদের কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফল হন নি। আর এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে যিনি সফল হবেন, তিনি হলেন তাদের ধারণাকৃত অদৃশ্য মাহদী (অর্থাৎ তাদের মাহদী)। দেখুন: আল-আশকার, আর-রাসূল ওয়ার রিসালাত, পৃষ্ঠা ২১২, ২১৩

[55] শাইখ আবূল হাসান আন-নদভী, সূরাতানে মুতাদাম্মাতান, শব্দের রূপ পরিবর্তন করে, পৃষ্ঠা ১৩/৫৩/৫৪/৫৮/৫৯

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সম্মান ও মর্যাদা

সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর তা'আলার নবী ও রাসূলগণের পরে দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্য সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যদাবান মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন নবী-রাসূলগণের পর অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ﴾ [ال عمران : ١١٠]

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্য যাদের আগমন হয়েছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১১০]

তিনি আরও বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ﴾ [البقرة : ١٤٣]

"আর এভাবে আমরা তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী (সর্বোত্তম) জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির ওপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন"। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৪৩]

এ আয়াত দু'টি সকল সাহাবীর মর্যাদার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণাপত্র। কেননা, এ বক্তব্যের দ্বারা সরাসরি সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ হলেন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা সাহাবীগণের উপমা পেশ করেছেন তাওরাত ও ইঞ্জীলের মতো প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবে, যে কথা তিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন এভাবে:

﴿ مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطۡـَٔهُۥ فَـَٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح: ٢٩]

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু‘ ও সাজদায় অবনত দেখবেন। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডল সাজদাহ’র প্রভাবে পরিস্ফুট। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইঞ্জীলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কচিপাতা, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

সাধারণ মুফাসসিরীন-সহ ইমাম কুরতুবী বলেন, ‘তাঁর সহচরগণ’ এর মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের গোটা জামাতই অন্তর্ভুক্ত। এতে সকল সাহাবীর ন্যায়নিষ্ঠতা, তাঁদের হৃদয় ও মনের পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা এবং তাঁদের সম্পর্কে ব্যাপক প্রশংসার বাণী ঘোষিত হয়েছে খোদ জগৎ স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে।

আবু উরওয়াহ যুবাইরি বলেন, একদিন আমি ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে লোকজন এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, লোকটি সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলে থাকে।একথা শুনে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের অংশ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّار (অর্থ:যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন) তেলাওয়াত করে বললেন,যেই ব্যক্তির অন্তরে প্রিয় নবীর কোনো সাহাবীর ব্যাপারে বিদ্বেষ থাকবে,সে এই আয়াতের শাস্তি পাবে। অর্থাৎ তার ঈমান বিপদজনক অবস্থায় পড়ে যাবে। কেননা আয়াতের মধ্যে কোনো সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকে কাফেরদের আলামত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলেন:

“وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِين اتَّبَعُوه بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

এই আয়াতটির অর্থ: "আর (ওদের মধ্যে) যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন (অগ্রগামী), এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।"

এখানে সাহাবায়ে কেরামের দুটো স্তরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এক. অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন (সাবেকীনে আওয়ালীন)

দুই. পরবর্তীতে ঈমান গ্রহণকারী।

উভয় স্তরের সাহাবীদের সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে –

‘তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ রূপে তুষ্ট। তাদের জন্য অনন্তকালের জান্নাত নির্ধারিত’ সকল সাহাবিই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।মুহাজিরীন ও সাহাবীদের চেয়ে সাবেকীনে আওয়ালিন (অগ্রগামী প্রথম পুরাতন) আর কারা?

সাবেকীনে আওয়ালিনের ব্যাখ্যা: প্রথম ব্যাখ্যা - হযরত আবু মুসা আশআরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী প্রমূখের। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা এই যে, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বাইতুল্লাহর দিকে কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে।এই ঘটনার পূর্বেই যারা ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার অনন্য গৌরব লাভ করেছিলেন তাঁরাই সাবেকীনে আওয়ালিন (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন)। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা –ইমাম শাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত, হিজরতের ৬ষ্ঠ বর্ষে সংঘঠিত ‘বাইয়াতে রিদওয়ানে’ যাঁরা শরীক হয়েছিলেন, তাঁরাই ‘সাবেকীনে আওয়ালীন’ (অগ্রগামী প্রথম ও পুরাতন হিসেবে গণ্য।

‘সাবেকীনে আওয়ালীন' এর যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক অর্থাৎ উভয় কেবলার দিকে নামায আদায়কারী সাহাবী হোন অথবা বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী হোন, তাঁদের পরেও সাহাবীর গৌরব অর্জনকারীদের সকলেই আল্লাহ তায়ালা وَالَّذِيْنَ اتَّبِعُوْهُمْ بِاِحْسَان (এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে) অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সকলের জন্যেই নিজের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [فاطر: 32]।

‘বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর আমি [কোরআনের] উত্তরাধিকারী করেছি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে; অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে,এটা মহা অনুগ্রহ।’

–সূরা আন্-নমল:৫৯, সূরা ফাতির:৩২

উক্ত দুই আয়াতেই সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত বান্দা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।পরে তাঁদেরই একটি শ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী'। এতে বুঝা যায় সাহাবায়ে কেরামের কারও দ্বারা যদি কখনো কোনো গুনাহ হয়েও থাকে, তবে তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।নইলে তাদেরকে 'মনোনীত বান্দার' মধ্যে উল্লেখ করা হতো না। কুরআনের প্রথম অধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে তাঁরা আল্লাহ তায়ালার 'মনোনীত বান্দা'।আর প্রথম আয়াতে সেই মনোনীত বান্দাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম এসেছে। এভাবে সকল সাহাবিই মহান সৃষ্টিকর্তার এই সালামের মধ্যে শামিল রয়েছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন,তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী,এটা আল্লাহর কৃপা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'
–সূরা হুজুরত:৭-৮

এই দুই আয়াতে সকল সাহাবী সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর, পাপাচার ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।
এখানে যে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো,আশা করি এগুলোই সাহাবীদের মর্যাদা, তাঁদের মাকবুল ও মাগফুর (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) হওয়া, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত তাঁদের জন্য অবধারিত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের অনন্য মর্যাদা

হাদীস - ১

বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -

خَيْرُا لِنّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ _فَلَا ادري ذَكَرَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً. ثُمَّ بَعْدَ هُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُوْن وَلَا يُشْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَايُؤْ تَمَنُوْنَ وَيُنْذِرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السَّمَنُ

'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, মর্যাদার বিচারে এর পরের স্থানে তাদের যুগ যারা আমার যুগের সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে মিলিত। এরপর তাদের যুগ যারা তাদের (তাবেঈদের) সঙ্গে মিলিত। বর্ণনাকারী বলেন, এখন আমার মনে নাই যে তিনি যুগ দুটি উল্লেখ করেছিলেন না তিনটি। এরপর এমন এমন লোক আসবে যারা না চাইলেও সাক্ষ্য দিতে তৈরি হয়ে যাবে। খিয়ানত করবে,আমানত রক্ষা করবে না,ওয়াদা ভঙ্গ করবে, অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। তাদের মাঝে (আদর্শিক চিন্তা-চেতনা না থাকার দরুন) স্থুলতা প্রকাশ পাবে।'

এই হাদীসে যদি যুগের উল্লেখ দুবার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় যুগ সাহাবীদের এবং তৃতীয় যুগ তাবেঈদের। তিনবার বললে চতুর্থ যুগ তাবে তাবেঈগণের–হাদীসের মধ্যে তাঁরাও শামিল হয়ে যাবেন।

হাদীস -২

لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِيْ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَوْ اَنْفَقَ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ

'খবরদার আমার সাহাবীদের মন্দ বলো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় পরিমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে তাহলে সেটা সাহাবীদের এক মুদ অথবা আধা মুদের সমানও হবে না।'(মুদ এক কেজির কাছাকাছি একটি পরিমাণ)

এই হাদীস সাহাবীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অনন্য মর্যাদার কথা তুলে ধরেছে। অন্যদের পাহাড় পরিমান স্বর্ণও তাঁদের এক কেজি বরং আধা কেজি পরিমাণ দানের কাছাকাছি মর্যাদা পাবে না। তাহলে সাহাবীদের আমলকে অন্যদের আমলের সঙ্গে কী করে তুলনা করা সম্ভব?

হাদীস - ৩

তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

اَللّٰه اللّٰه فِيْ اَصْحَابِيْ، لَا تَتَّخِذُوْ هُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِیْ.فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّیْ اَحَبَّهُم وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ. وَمَنْ اَذَانِیْ وَمَنْ اَذَانِیْ فَقَدْ اذَی اللّٰه وَمَنْ اَذَی اللّٰه فَيُوْشِكُ اَنْ يَّأْخُذَهُ

‘সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না।যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল,সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাদের মুহাব্বত করল।যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখলো,সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো,যে ব্যক্তি তাদের কাউকে কষ্ট দিলো সে আমাকেই কষ্ট দিল।যে আমাকে কষ্ট দিল,সে আল্লাহকে কষ্ট দিল।যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তায়ালা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।’
‘যে ব্যক্তি তাদের মুহাব্বত করল, প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বতের কারণেই সে তাদের মুহাব্বত করল’ বাক্যটির দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে:

এক- সাহাবীদের প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসা, আমার প্রতি মুহাব্বত-ভালোবাসার আলামত, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই তাঁদের ভালোবাসে যার অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা আছে।

দুই- যে ব্যক্তি আমার কোনো সাহাবীকে ভালোবাসে,এর অর্থ সেই ব্যক্তির প্রতি আমি মুহাম্মদের ভালোবাসা রয়েছে।একই ব্যাখ্যা বিদ্বেষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হোক এই হাদীস তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক সঙ্কেত, যারা সাহাবায়ে কেরামকে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট সমালোচনার লক্ষ্য বানিয়ে থাকেন, তাঁদের ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেন বা লেখেন যার কারণে শ্রোতা বা পাঠক তাঁদের ব্যাপারে আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে,সাহাবীদের সমালোচনা করা প্রিয় নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সমতুল্য।

হাদীস - ৪

ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন -

مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فَاِنَّهُم اَبَرُّهَذِهِ الأُمَّةِ قُلُوْبًا وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا وَ اَقَلُّهَا تَكَلُّفًا وَ اَقْوَمُهَا هَدْيًا وَاَحْسَنُهَا حَالًا. قَوْمٌ اِخْتَارَهُمُ اللهُ بِصُحْبَةِ نَبِيِّه وَاِقَامَةِ دِيْنِهِ-فَاعْرِفُوْا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوْا اٰثَارَهُمْ فَاِنَّهُمْ كَانُوْا عَلٰى الهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ-

'কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিত প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা।কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ্য করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো।কারণ তাঁরাই সরল,সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।

আর সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ছাড়াও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে আরও অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কিছু বক্তব্য নিম্নরূপ:

১. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ 'আনহুমা বলেন,

»لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مع النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أربعين سنة .«

"তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না; কারণ, তাদের কোনো একজনের এক ঘন্টা সময় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করার মূল্যমান তোমাদের কোনো একজনের চল্লিশ বছরের আমলের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।"[3]

২. আর ওকী‘ রহ.-এর অপর এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

»لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عبادة أَحَدِكُمْ عُمْرَه ُ».

“তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে গালি দিও না; কারণ, তাদের কোনো একজনের এক ঘন্টা সময় (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) অবস্থান করার মূল্যবান তোমাদের কোনো একজনের গোটা জীবনের ইবাদতের চেয়েও অনেক বেশি উত্তম।”[4]

৩. মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

»لا تسبوا أصحاب محمد إن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون «.

“তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণকে গালি দিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি জানেন যে, তারা অচিরেই নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে।”[5]

৪. ইমাম আহমদ রহ. তার আকীদা প্রসঙ্গে বলেন, “সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন নগণ্য সাহাবীর মর্যাদা ঐ যুগের সকল ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যারা তাকে দেখে নি, যদিও তারা তাদের সকল আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে।”[6]

৫. ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেন, “এক মুহূর্তের জন্য হলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য পাওয়ার মর্যাদার সমতুল্য কোনো আমলই হতে পারে না; আর কোনো কিছুর বিনিময়ে তার সমমর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর ফযীলত বা মর্যাদার বিষয়টি কিয়াসের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় না। এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।”[7]

৬. আর আবু উমার ইবন আবদিল বার রহ ‘আল-ইস্তি‘য়াব’ গ্রন্থে বলেন,

»قد كُفينا البحثَ عن أحوالِهم، لإجماع أهل الحقِّ من المسلمين، وهم أهلُ السنة والجماعة؛ على أنهم كلُّهم عدول .«

“তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ -এ কথার ওপর মুসলিমগণের মধ্য থেকে হকপন্থীগণের ইজমা‘র কারণে আমাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানীয় আলোচনা-পর্যালোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে আর হকপন্থীগণ হলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত।”[৪]

৭. মুহাম্মাদ ইবনুল ওযীর আল-ইয়ামানী সাহাবীগণের ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নে সংঘটিত ‘ইজমা’-এর বর্ণনা নকল করেছেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের পক্ষ থেকে এবং শী‘আয়ে যায়েদিয়া ও মু‘তাযিলাদের পক্ষ থেকেও। আর অনুরূপ বক্তব্য আস-সানা‘য়ানী রহ.-এরও।[৭]

সাহাবীগণের মধ্যকার সংঘটিত ঘটনা নিয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا، وإذا ذكر النجوم فامسكوا «.

"যখন আমার সাহাবীগণকে নিয়ে সমালোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। আর যখন তাকদীর নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে আর যখন তারকারাজি তথা জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হবে, তখন তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে।"[1]

আর এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি হলো সাহাবীগণের ভুল-ত্রুটি আলোচনা এবং তাদের বিচ্যুতি বা পদস্খলনের বিষয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, আর তাদের মধ্যকার সংঘটিত বিতর্কের মধ্যে ডুবে না থাকা।

আবু না'য়ীম রহ. বলেন, "সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ভুল-ত্রুটি আলোচনা এবং তাদের বিচ্যুতি বা পদস্খলনের বিষয়ে সমালোচনা থেকে বিরত থাকা, তাদের ভালো ও সুন্দর দিকসমূহ এবং তাদের গুণাবলী ও কৃতিত্বসমূহ প্রকাশ করা, আর তাদের কর্মকাণ্ডসমূহকে অনিবার্য কারণের দিকে ফিরিয়ে দেওয়াটা তাদেরকে যথাযথ অনুসরণকারী মুমিনদের লক্ষণ, যাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীর মাধ্যমে:

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

তিনি নির্দেশিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আরও বলেন: "তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ভালো ও সুন্দর দিকসমূহ এবং তাদের মর্যাদা ও ফযীলতসমূহ আলোচনা করা থেকে

বিরত থাকার নির্দেশ দেন নি। তাদেরকে শুধু তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা এবং রাগজনিত উত্তেজনার সময় তাদের থেকে যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে, তার সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”[2]

হাদীসে নির্দেশিত বিরত থাকার মানে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিরত থাকা, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধসমূহ ও মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডুবে না থাকা এবং বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা না করা আর এ বিষয়গুলো সাধারণ জনগণের মাঝে প্রকাশ না করা অথবা এক দলের দোষ ধরা এবং অপর দলের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে তাদের পিছনে না লাগা।[3]

আর আমাদেরকে পূর্বে যা অতিবাহিত হয়েছে, সে বিষয় আলোচনার নির্দেশ দেওয়া হয় নি; বরং আমাদেরকে শুধু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে, তাদেরকে ভালোবাসতে এবং তাদের সৌন্দর্যপূর্ণ দিক ও মর্যাদাপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ করতে; কিন্তু যখন কোনো বিদ‘আতপন্থী আত্মপ্রকাশ করে তাদের ব্যাপারে অপবাদ দেয়, তখন জরুরি ভিত্তিতে তাদেরকে সে অপবাদ থেকে রক্ষা করা এবং ইলম ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এমন বিষয় আলোচনা করা, যা তার যুক্তিকে অসার করে দিবে তা বর্ণনা করা অপরিহার্য।[4]

আর এটি এমন একটি বিষয়, আমাদের সময়ে আমরা যার প্রয়োজন অনুভব করি, যেমন মুসলিম জাতিকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও মদরাসাসমূহে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে এমন কতগুলো সিলেবাসের মাধ্যমে, যা তার সৃজনশীল ও শিক্ষা সম্পর্কিত কতৃপক্ষের চিন্তার ফসল। তারা সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত অনাকাঙ্খিত ঘটনার মাঝে ডুবে থাকে অন্যায়ভাবে, কোনো প্রকার আদব-কায়দার তোয়াক্কা না করেই, যা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে আফসোসের বিষয় হলো, এ শত্রুতামূলক আচরণ কোনো কোনো ইসলামপন্থী ব্যক্তির মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে, এমনকি তাদের কেউ কেউ সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ থেকে বাজে বর্ণনা কিংবা দামী কথা সংগ্রহ করে, অতঃপর সে বিশেষজ্ঞ ইমামদের কথা ও তাদের বিশ্লষণসমূহের কোনো প্রকার সঠিক দিকনির্দেশনা তোয়াক্কা না করেই সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সাহাবীগণের ব্যাপারে হুকুম দেওয়া আরম্ভ করে দেয়, এ জন্যই আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি যে, আমরা এমন কিছু মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করব, যেগুলো একজন গবেষকের জন্য জেনে নেওয়া উচিত হবে,

যখন তিনি সাহাবীগণের মাঝে সংঘটিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন অনুভব করবেন।

[1] তাবারানী, আল-কবীর: ২/৭৮; আবু না'ঈম, আল-হিলইয়া: ৪/১০৮; আর আল-ইমামা এর মধ্যে বর্ণিত আছে, ইবনু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস থেকে এবং আলবানী কয়েকটি সনদের মাধ্যমে বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করেছেন; আস-সিলসিলাতুস সহীহা: ১/৩৪

[2] আল-ইমামা, পৃষ্ঠা ৩৪৭

[3] মুহাম্মদ ইবন সামেল আল-'আলইয়ানী আস-সুলামী, মানহজু কিতাবাতিত্ তারিখিল ইসলামী: পৃষ্ঠা ২২৭, ২২৮

[4] মিনহাজুস সুন্নাহ: ৬/২৫৪, সম্পাদনা: ড. রাশাদ সালেম।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলব যে, সাহাবীগণ হলেন আল্লাহর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী এবং নবী ও রাসূলগণের পরে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দনীয় ও প্রিয় মানুষ। আর ঈমানের দিক থেকে তারা হলেন অগ্রগামী পূর্বপুরুষ এবং রাহমানের সন্তুষ্টি অর্জনকারী ব্যক্তিবর্গ। তাদেরকে মহব্বত করাটা আনুগত্য ও ঈমান এবং তাদেরকে ঘৃণা করাটা নিফাকী ও সীমালংঘন। তারা হলেন এ উম্মতের মধ্যে মনের দিক থেকে সবচেয়ে সুহৃদ ও সৎ মানসিকতাসম্পন্ন, ঈমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন, সবচেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতা প্রিয়, (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহচর্য ও সহযোগিতার দিক থেকে তারা অনেক দূর এগিয়ে এবং তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রত্যয়ন ও প্রশংসার দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ অবস্থানে, পুরস্কারের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এবং পরিমাপকের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী হলেন সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর হলেন ‘ফারুক’ নামে প্রসিদ্ধ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু; আর এ ব্যাপারে সাহাবী ও তাবে‘ঈন মুমিনগণের পক্ষ থেকে ‘ইজমা’ সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর যুন-নূরাইন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, যিনি বালকদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ করেছেন। আর তারা হলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন এবং সুপথপ্রাপ্ত ইমাম। আর তাদের পরবর্তী পর্যায়ের হলেন ‘আশারায়ে মুবাশশিরীনের (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের) অবশিষ্ট ছয়জন। আর তাদের পেছনে রয়েছেন পুণ্যবান মুহাজিরগণের একেবারে প্রথম ধাপের অগ্রগামী দল। তারপর আছেন প্রথম শ্রেণির আনসারগণ। তার পরবর্তী স্তরে রয়েছেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা পুরস্কারের অধিকারী এবং যাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যারা আঘাতপ্রাপ্ত ও কঠিন পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরেও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। অতঃপর ‘বায়‘আতে রিদওয়ান’-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ, যাদের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিনি মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন, হিজরত করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। আর তাদের সকলের জন্যই রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিশ্রুতি।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির ওপর ফরয হলো তাদেরকে মহব্বত করা এবং তাদের সকলের ব্যাপারে (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলে) সন্তুষ্টি কামনা করা। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে ঘৃণা করে অথবা তাদের দুর্নাম করে এবং তাদের মন্দ সমালোচনা করে, তাকে ঘৃণা করা।

আর যেমনিভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে তারতম্য রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও পরিমাণগত তারতম্য হবে। আর তাদেরকে অনুসরণ করা এবং তাদের হিদায়াত বা নির্দেশনা দ্বারা হিদায়াত লাভ করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া অথবা তাদের মর্যাদাকে কোনো রকম খাটো করা ছাড়া। সুতরাং (মনে রাখতে হবে) তারা নিষ্পাপ নন এবং তারা অপরাপর মুমিনগণের কারো মতও নন।

আরও কর্তব্য হচ্ছে তাদের মাঝে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ব্যাপারে সমালোচনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকা এবং তাদের জন্য দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। সুতরাং শুধু তাদের ভালো ও সুন্দর বিষয়গুলোই আলোচনা করা যাবে, আর যে ব্যক্তি তাদের মন্দ সমালোচনা করবে, সে পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে এবং কঠিন শাস্তির মুখোমুখী হবে।

পরিশেষে আমাদের আবেদন আল-কুরআনের শিখানো ভাষায়:

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : ١٠]

“হে আমাদের রব! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় আপনি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১০]

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করুন, যে ব্যক্তি আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসে, তাদেরকে (অপবাদের অভিযোগ থেকে) রক্ষা করে, তাদের প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাদের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .